দুর্গরহস্য

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

891.443
শরদিন্দু/দু

বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—পৌষ, ১৩৫৯
দ্বিতীয় প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬১
তৃতীয় প্রকাশ—(প্রথম বাক্-সংস্করণ)—চৈত্র, ১৩৭১
চতুর্থ প্রকাশ—মাঘ, ১৩৭৩
পঞ্চম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৮৬

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীসতীশচন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেশন প্রাঃ লিমিটেড
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীঅজিত গুপ্ত

নয় টাকা

উৎসর্গ

আধুনিক কালের যে সকল তরুণ-তরুণীর নির্বন্ধে সতরো-বছর পরে আবার ব্যোমকেশের গল্প লিখলাম, বইখানি তাহাদের হাতেই উৎসর্গ করা হ'ল।

চিত্রচোর

১

কাচের পেয়ালায় ডালিমের রস লইয়া সত্যবতী ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'নাও, এটুকু খেয়ে ফেল।'

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম বেলা ঠিক চারিটা। সত্যবতীর সময়ের নড়চড় হয় না।

ব্যোমকেশ আরাম কেদারায় বসিয়া বই পড়িতেছিল, কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে পেয়ালার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'রোজ রোজ ডালিমের রস খাব কেন?'

সত্যবতী বলিল, 'ডাক্তারের হুকুম।'

ব্যোমকেশ ভ্রূকুটিকুটিল মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, 'ডাক্তারের নিকুচি করেছে। ও খেতে আমার ভাল লাগে না। কি হবে খেয়ে?'

সত্যবতী বলিল, 'গায়ে রক্ত হবে। লক্ষীটি, খেয়ে ফেল।'

ব্যোমকেশ চকিতে একবার সত্যবতীর মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিল, প্রশ্ন করিল, 'আজ রাত্তিরে কি খেতে দেবে?'

সত্যবতী বলিল, 'মুর্গীর সুরুয়া আর টোষ্ট।'

ব্যোমকেশের ভ্রূকুটি গভীর হইল, 'হুঁ, সুরুয়া।—আর মুর্গীটা খাবে কে?'

সত্যবতী মুখ টিপিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো।'

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'শুধু ঠাকুরপো নয়, তোমার অর্ধাঙ্গিনীও ভাগ পাবেন।'

ব্যোমকেশ আমার পানে একবার চোখ পাকাইয়া তাকাইল, তারপর বিকৃত মুখে ডালিমের রসটুকু খাইয়া ফেলিল।

কয়েকদিন হইল ব্যোমকেশকে লইয়া সাঁওতাল পরগণার একটি শহরে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছি। কলিকাতায় ব্যোমকেশ হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিল; দুই মাস যমে-মানুষে টানাটানির পর তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছি। রোগীর সেবা করিয়া সত্যবতী কাঠির মত

রোগা হইয়া গিয়াছিল, আমার অবস্থাও কাহিল হইয়াছিল। তাই ডাক্তারের পরামর্শে পৌষের গোড়ার দিকে সাঁওতাল পরগণার প্রাণপ্রদ জলহাওয়ার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখানে আসিয়া ফলও মন্ত্রের মত হইয়াছে। আমার ও সত্যবতীর শরীর তো চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছেই, ব্যোমকেশের শরীরেও দ্রুত রক্তসঞ্চার হইতেছে এবং অসম্ভব রকম ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়াছে। দীর্ঘ রোগভোগের পর তাহার স্বভাব অবুঝ বালকের ন্যায় হইয়া গিয়াছে; সে দিবারাত্র খাই-খাই করিতেছে। আমরা দু'জনে অতি কষ্টে তাহাকে সামলাইয়া রাখিয়াছি।

এখানে আসিয়া অবধি মাত্র দুই জন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছে। এক, অধ্যাপক আদিনাথ সোম; তাঁহার বাড়ির নীচের তলাটা আমরা ভাড়া লইয়াছি। দ্বিতীয়, এখানকার স্থানীয় ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক। রোগী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, তাই সর্বাগ্রে ডাক্তারের সহিত পরিচয় করিয়া রাখা প্রয়োজন মনে হইয়াছে।

শহরে আরও অনেকগুলি বাঙালী আছেন কিন্তু কাহারও সহিত এখনও আলাপের সুযোগ হয় নাই। এ কয়দিন বাড়ির বাহির হইতে পারি নাই, নূতন স্থানে আসিয়া গোছগাছ করিয়া বসিতেই দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ প্রথম সুযোগ হইয়াছে; শহরের একটি গণ্যমান্য বাঙালীর বাড়িতে চা-পানের নিমন্ত্রণ আছে। আমরা যদিও এখানে আসিয়া নিজেদের জাহির করিতে চাহি নাই, তবু কাঁঠালী চাঁপার সুগন্ধের মত ব্যোমকেশের আগমন-বার্তা শহরে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে চায়ের নিমন্ত্রণ আসিয়াছে।

ব্যোমকেশকে এত শীঘ্র চায়ের পার্টিতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না; কিন্তু দীর্ঘকাল ঘরে বন্ধ থাকিয়া সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে; ডাক্তারও ছাড়পত্র দিয়াছেন। সুতরাং যাওয়াই স্থির হইয়াছে।

আরাম কেদারায় বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে ব্যোমকেশ উসখুস্ করিতে-ছিল এবং বারবার ঘড়ির পানে তাকাইতেছিল! আমি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া অলস ভাবে সিগারেট টানিতেছিলাম; সাঁওতাল পরগণার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। এখানে শুকতার

সহিত শ্যামলতার, প্রাচুর্যের সহিত রিক্ততার নিবিড় মিলন ঘটিয়াছে; মানুষের সংস্পর্শ এখানকার কঙ্করময় মাটিকে গলিত পঙ্কিল করিয়া তুলিতে পারে নাই।

ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'রিক্‌সা কখন আসতে বলেছ?'

বলিলাম, 'সাড়ে চারটে।'

ব্যোমকেশ আর একবার ঘড়ির পানে তাকাইয়া পুস্তকের দিকে চোখ নামাইল। বুঝিলাম ঘড়ির কাঁটার মন্থর আবর্তন তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। হাসিয়া বলিলাম, 'রাই ধৈর্যং রহু ধৈর্যং—।'

ব্যোমকেশ খিঁচাইয়া উঠিল, 'লজ্জা করে না! আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট খাচ্ছ।'

অর্ধদগ্ধ সিগারেট জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। ব্যোমকেশ এখনও সিগারেট খাইবার অনুমতি পায় নাই; সত্যবতী কঠিন দিব্য দিয়াছে—তাহার অনুমতি না পাইয়া সিগারেট খাইলে মাথা খাইবে, মরা মুখ দেখিবে। আমিও ব্যোমকেশের সম্মুখে সিগারেট খাইতাম না; প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নেশাখোরকে লোভ দেখানোর মত পাপ আর নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যাইত।

২

ঠিক সাড়ে চারিটার সময় বাড়ির সদরে দুইটি সাইকেল রিক্‌শা আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা প্রস্তুত ছিলাম; সত্যবতীও ইতিমধ্যে সাজপোশাক করিয়া লইয়াছিল। আমরা বাহির হইলাম।

আমাদের বাড়ির একতলার সহিত দোতলার কোনও যোগ ছিল না, সদরের খোলা বারান্দার ওপাশ হইতে উপরের সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছিল। বাড়ির সম্মুখে খানিকটা মুক্ত স্থান, তারপর ফটক। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম আমাদের গৃহস্বামী অধ্যাপক সোম বিরক্তগম্ভীর মুখে ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।

অধ্যাপক সোমের বয়স বোধ করি চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁহাকে

দেখিয়া ত্রিশের বেশী বয়স মনে হয় না ; তাঁহার আচার-ব্যবহারেও প্রৌঢ়ত্বের ছাপ নাই। সব কাজেই চটপটে উৎসাহশীল। কিন্তু তাঁহার জীবনে একটি কাঁটা ছিল, সেটি তাঁর স্ত্রী। দাম্পত্য জীবনে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

প্রোফেসর সোম বাহিরে যাইবার উপযোগী সাজগোজ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আমাদের দেখিয়া করুণ হাসিলেন। তিনিও চায়ের নিমন্ত্রণে যাইবেন জানিতাম, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাঁড়িয়ে যে! যাবেন না?'

প্রোফেসর সোম একবার নিজের বাড়ির দ্বিতলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'যাব। কিন্তু গিন্নীর এখনও প্রসাধন শেষ হয় নি। আপনারা এগোন।'

আমরা রিক্‌শাতে চড়িয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী একটাতে বসিল, অন্যটাতে আমি একা। ঘণ্টি বাজাইয়া মনুষ্য-চালিত ত্রিচক্র-যান ছাড়িয়া দিল। ব্যোমকেশের মুখে হাসি ফুটিল। সত্যবতী সযত্নে তাহার গায়ে শাল জড়াইয়া দিল। অতর্কিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া না যায়।

কাঁকর-ঢাকা উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়া দুই দিক দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। রাস্তার দু'ধারে ঘরবাড়ির ভিড় নাই, এখানে একটা ওখানে একটা। শহরটি যেন হাত-পা ছড়াইয়া অসমতল পাহাড়তলীর উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে, গাদাগাদি ঠেসাঠেসি নাই। আয়তনে বিস্তৃত হইলেও নগরের জনসংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু সমৃদ্ধি আছে। আশেপাশে কয়েকটি অভ্রের খনি এখানকার সমৃদ্ধির প্রধান সূত্র। আদালত আছে, ব্যাঙ্ক আছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা গণ্যমান্য তাঁরা প্রায় সকলেই বাঙালী।

যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহার নাম মহীধর চৌধুরী। অধ্যাপক সোমের কাছে শুনিয়াছি ভদ্রলোক প্রচুর বিত্তশালী ; বয়সে প্রবীণ হইলেও সর্বদাই নানাপ্রকার হুজুগ লইয়া আছেন ; অর্থব্যয়ে মুক্ত-হস্ত। তাঁহার প্রযোজনায় চড়ুইভাতি, শিকার, খেলাধুলা লাগিয়াই আছে।

মিনিট দশ পনেরোর মধ্যে তাঁহার বাসভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রায় দশ বিঘা জমি পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, হঠাৎ দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। ভিতরে রকমারি গাছপালা, মরসুমি ফুলের কেয়ারি, উঁচু-নীচু পাথুরে জমির

উপর কোথাও লাল-মাছের বাঁধানো সরোবর, কোথাও নিভৃত বেতসকুঞ্জ, কোথাও বা কৃত্রিম-ক্রীড়াশৈল। সাজানো বাগান দেখিয়া সহসা বনানীর বিভ্রম উপস্থিত হয়। মহীধরবাবু যে ধনবান তাহা তাঁহার বাগান দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না।

বাড়ির সম্মুখে ছাঁটা ঘাসের সমতল টেনিস কোর্ট, তাহার উপর টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সাজাইয়া নিমন্ত্রিতদের বসিবার স্থান হইয়াছে, শীতের বৈকালী রৌদ্র স্থানটিকে আতপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর দোতলা বাড়িটি যেন এই দৃশ্যের পশ্চাৎপট রচনা করিয়াছে। আমরা উপস্থিত হইলে মহীধরবাবু সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ভদ্রলোকের দেহায়তন বিপুল, গৌরবর্ণ দেহ, মাথায় সাদা চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, দাড়িগোঁফ কামানো, গাল দুটি চালতার মত, মুখে ফুটি-ফাটা হাসি। দেখিলেই মনে হয় অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক।

তিনি তাঁহার মেয়ে রজনীর সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটির বয়স কুড়ি-একুশ, সুশ্রী গৌরাঙ্গী হাস্যমুখী; ভাসা-ভাসা চোখ দুটিতে বুদ্ধি ও কৌতুকের খেলা। মহীধরবাবু বিপত্নীক, এই মেয়েটি তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল এবং উত্তরাধিকারিণী।

রজনী মুহূর্ত্তমধ্যে সত্যবতীর সহিত ভাব করিয়া ফেলিল এবং তাহাকে লইয়া দূরের একটা সোফাতে বসাইয়া গল্প জুড়িয়া দিল। আমরাও বসিলাম। অতিথিরা এখনও সকলে আসিয়া উপস্থিত হন নাই, কেবল ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক ও আর একটি ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ডাক্তার ঘটক আমাদের পরিচিত, পূর্বেই বলিয়াছি; অন্য ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ হইল। এঁর নাম নকুলেশ সরকার; শহরের একজন মধ্যম শ্রেণীর ব্যবসাদার, তা ছাড়া ফটোগ্রাফির দোকান আছে। ফটোগ্রাফি করেন শখের জন্য, উপরন্তু এই সূত্রে কিছু-কিঞ্চিৎ উপার্জন হয়। শহরে অন্য ফটোগ্রাফার নাই।

সাধারণভাবে কথাবার্তা হইতে লাগিল। মহীধরবাবু এক সময় ডাক্তার ঘটককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ওহে ঘোটক, তুমি অ্যাদ্দিনেও ব্যোমকেশবাবুকে চাঙ্গা করে তুলতে পারলে না! তুমি দেখছি নামেও

ঘোটক কাজেও ঘোটক—একেবারে ঘোড়ার ডাক্তার!' বলিয়া নিজের রসিকতায় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নকুলেশবাবু ফোড়ন দিয়া বলিলেন, 'ঘোড়ার ডাক্তার না হয়ে উপায় আছে? একে অশ্বিনী তায় ঘোটক।'

ডাক্তার ইঁহাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, সে একটু হাসিয়া রসিকতা হজম করিল। ডাক্তারকে লইয়া অনেকেই রঙ্গ-রসিকতা করে দেখিলাম, কিন্তু তাহার চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে সকলেই শ্রদ্ধাশীল। শহরে আরও কয়েকজন প্রবীণ চিকিৎসক আছেন, কিন্তু এই তরুণ সৎস্বভাব ডাক্তারটি মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে বেশ পসার জমাইয়া তুলিয়াছে।

ক্রমে অন্যান্য অতিথিরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে আসিলেন সস্ত্রীক সপুত্র উষানাথ ঘোষ। ইনি একজন ডেপুটি, এখানকার সরকারী মালখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। লম্বা-চওড়া চেহারা, খসখসে কালো রঙ, চোখে কালো কাঁচের চশমা। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, গম্ভীরভাবে থামিয়া থামিয়া কথা বলেন, গম্ভীরভাবে হাসেন। তাঁহার স্ত্রীর চেহারা রুগ্ন, মুখে উৎকণ্ঠার ভাব, থাকিয়া থাকিয়া স্বামীর মুখের পানে উদ্বিগ্ন চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন। ছেলেটি বছর পাঁচেকের; তাহাকে দেখিয়াও মনে হয় যেন সর্বদা শঙ্কিত সঙ্কুচিত হইয়া আছে। উষানাথবাবু সম্ভবত নিজের পরিবার-বর্গকে কঠিন শাসনে রাখেন, তাঁহার সম্মুখে কেহ মাথা তুলিয়া কথা বলিতে পারে না।

মহীধরবাবু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলে তিনি গম্ভীর মুখে গলার মধ্যে দুই চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন; বোধ হয় তাহা লৌকিক সম্ভাষণ, কিন্তু আমরা কিছু শুনিতে পাইলাম না। তাঁহার চক্ষু দুইটি কালো কাঁচের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া রহিল। একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। যাহার চোখ দেখিতে পাইতেছি না এমন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ নাই।

তারপর আসিলেন পুলিসের ডি-এস্-পি পুরন্দর পাণ্ডে। ইনি বাঙালী নয়, কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলেন; বাঙালীর সহিত মেলামেশা করিতেও ভালবাসেন। লোকটি সুপুরুষ, পুলিসের সাজ-পোশাকে দিব্য মানাইয়াছে।

ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'আপনি এসেছেন, কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য একটি জটিল রহস্য দিয়ে যে আপনাকে সংবর্ধনা করব তার উপায় নেই। আমাদের এলাকায় রহস্য জিনিসটার একান্ত অভাব। সব খোলাখুলি। চুরি বাটপাড়ি যে হয় না তা নয়, কিন্তু তাতে বুদ্ধি খেলাবার অবকাশ নেই।'

ব্যোমকেশও হাসিয়া বলিল, 'সেটা আমার পক্ষে ভালই। জটিল রহস্য এবং আরও অনেক লোভনীয় বস্তু থেকে আমি উপস্থিত বঞ্চিত। ডাক্তারের বারণ।'

এই সময় আর একজন অতিথি দেখা দিলেন। ইনি স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। কৃশ ব্যক্তিত্বহীন চেহারা, তাই বোধ করি মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখিয়া চেহারায় একটু বৈশিষ্ট্য দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বয়স যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি একটা অনির্দিষ্ট স্থানে।

মহীধরবাবু বলিলেন, 'অমরেশবাবু আপনি ব্যোমকেশবাবুকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন—এই নিন।'

অমরেশবাবু নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'কীর্তিমান পুরুষকে দেখবার ইচ্ছা কার না হয়? আপনারাও কম ব্যস্ত হন নি, শুধু আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'কিন্তু আজ আসতে বড় দেরি করেছেন। সকলেই এসে গেছেন, কেবল প্রোফেসর সোম বাকি। তা তাঁর না হয় একটা ওজুহাত আছে! মেয়েদের সাজসজ্জা করতে একটু দেরী হয়। আপনার সে ওজুহাতও নেই। ব্যাঙ্ক তো সাড়ে তিনটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে।'

অমরেশ রাহা বলিলেন, 'তাড়াতাড়ি আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু বড়দিন এসে পড়ল, এখন কাজের চাপ একটু বেশী। বছর ফুরিয়ে আসছে। নূতন বছর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত আপনারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে আরম্ভ করবেন। তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে তো।'

ইতিমধ্যে কয়েকজন ভৃত্য বাড়ির ভিতর হইতে বড় বড় ট্রে'তে করিয়া নানাবিধ খাদ্য-পানীয় আনিয়া টেবিলগুলির উপর রাখিতেছিল; চা, কেক, সন্দেশ, পাঁপর-ভাজা ডালমুট ইত্যাদি। রজনী উঠিয়া গিয়া খাবারের

প্লেটগুলি পরিবেশন করিতে লাগিল। কেহ কেহ নিজেই গিয়া প্লেট তুলিয়া লইয়া আহার আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসি গল্প আলাপ আলোচনা চলিল।

রজনী মিষ্টান্নের একটি প্লেট লইয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে দাঁড়াইল। হাসি-মুখে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একটু জলযোগ।'

ব্যোমকেশ আড়চোখে একবার সত্যবতীর দিকে তাকাইল, দেখিল সত্যবতী দূর হইতে একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে। ব্যোমকেশ ঘাড় চুলকাইয়া বলিল, 'আমাকে মাপ করতে হবে। এসব আমার চলবে না।'

মহীধরবাবু ঘুরিয়া ফিরিয়া খাওয়া তদারক করিতেছিলেন, বলিলেন, 'সে কি কথা! একেবারেই চলবে না? একটু কিছু—? ওহে ডাক্তার, তোমার রোগীর কি কিছুই খাবার হুকুম নেই?'

ডাক্তার টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া এক মুঠি ডালমুট মুখে ফেলিয়া চিবাইতেছিল, বলিল, 'না খেলেই ভাল!'

ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল, 'শুনলেন ত! আমাকে শুধু এক পোয়ালা চা দিন। ভাববেন না, আবার আমরা আসব; আজকের আসাটা মুখবন্ধ মাত্র।'

মহীধরবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'আমার বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা কেউ না কেউ পায়ের ধুলো দেন। আপনারাও যদি মাঝে মাঝে আসেন সান্ধ্য-বৈঠক জমবে ভাল।'

এতক্ষণে অধ্যাপক সোম সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিলেন! সোমের একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব। বস্তুত লজ্জা না হওয়াই আশ্চর্য। সোম-পত্নী মালতী দেবীর বর্ণনা আমরা এখনও দিই নাই, কিন্তু আর না দিলে নয়। বয়সে তিনি স্বামীর প্রায় সমকক্ষ; কালো মোটা শরীর, থলথলে গড়ন, ভাঁটার মত চক্ষু সর্বদাই গর্বিতভাবে ঘুরিতেছে; মুখশ্রী দেখিয়া কেহ মুগ্ধ হইবে সে সম্ভাবনা নাই। উপরন্তু তিনি সাজ-পোশাক করিয়া থাকিতে ভাল-বাসেন। আজ যেরূপ সর্বালঙ্কার ভূষিতা হইয়া চায়ের জলসায় আসিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরাদেরও চমক লাগিবার কথা। পরিধানে ডগ্‌ডগে

লাল মাদ্রাজী সিল্কের শাড়ী, তার উপর সর্বাঙ্গে হীরা-জহরতের গহনা। তাঁহার পাশে সোমের কুণ্ঠিত ম্রিয়মাণ মূর্তি দেখিয়া আমাদেরই লজ্জা করিতে লাগিল।

রজনী তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল, কিন্তু মালতী দেবীর মুখে হাসি ফুটিল না। তিনি বক্রচক্ষে রজনীর মুখ হইতে স্বামীর মুখ পর্যন্ত দৃষ্টির একটি কশাঘাত করিয়া চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

খাওয়া এবং গল্প চলিতে লাগিল। ব্যোমকেশ মুখে শহীদের ন্যায় ভাবব্যঞ্জনা ফুটাইয়া চুমুক দিয়া দিয়া চা খাইতেছে; আমি নকুলেশবাবুর সহিত আলাপ করিতে করিতে পানাহার করিতেছি; উষানাথবাবু গম্ভীর-মুখে পুরন্দর পাণ্ডের কথা শুনিতে শুনিতে ঘাড় নাড়িতেছেন; তাঁহার ছেলেটি লুব্ধভাবে খাবারের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইয়া শঙ্কিত-মুখে আবার ফিরিয়া আসিতেছে; তাহার মা খাবারের একটি প্লেট হাতে ধরিয়া পর্যায়ক্রমে ছেলে ও স্বামীর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এই সময় বাক্যালাপের মিলিত কলস্বরের মধ্যে মহীধরবাবুর ঈষদুচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল, 'মিষ্টার পাণ্ডে খানিক আগে বলছিলেন যে আমাদের এলাকায় জটিল রহস্যের একান্ত অভাব। এ কথা কতদূর সত্য আপনারা বিচার করুন। কাল রাত্রে আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।'

স্বরগুঞ্জন নীরব হইল; সকলের দৃষ্টি গিয়া পড়িল মহীধরবাবুর উপর। তিনি হাস্যবিকশিত মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, যেন সংবাদটা ভারি কৌতুকপ্রদ।

অমরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিছু চুরি গেছে নাকি?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'সেইটেই জটিল রহস্য। ড্রয়িংরুমের দেয়াল থেকে একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ চুরি গেছে। রাত্রে কিছু জানতে পারি নি, সকালবেলা দেখলাম ছবি নেই; আর একটা জানালা খোলা রয়েছে।'

পুরন্দর পাণ্ডে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'ছবি! কোন্ ছবি?'

'একটা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ। মাসখানেক আগে আমরা পিক্‌নিকে গিয়েছিলাম, সেই সময় নকুলেশবাবু তুলেছিলেন।

পাণ্ডে বলিলেন, 'হুঁ। আর কিছু চুরি করে নি? ঘরে দামী জিনিস কিছু ছিল?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'কয়েকটা রূপোর ফুলদানী ছিল; তা ছাড়া পাশের ঘরে অনেক রূপোর বাসন ছিল! চোর এসব কিছু না নিয়ে স্রেফ একটি ফটো নিয়ে পালাল। বলুন দেখি জটিল রহস্য কি না?'

পাণ্ডে তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া বলিলেন, 'জটিল রহস্য মনে করতে চান মনে করতে পারেন। আমার তো মনে হয় কোনও জংলী সাঁওতাল জানালা খোলা পেয়ে ঢুকেছিল, তারপর ছবির সোনালী ফ্রেমের লোভে ছবিটা নিয়ে গেছে।'

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার কি মনে হয়?'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ ইহাদের সওয়াল জবাব শুনিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু অলসভাবে চারিদিকে ঘুরিতেছিল। সে এখন একটু সচেতন হইয়া বলিল, 'মিষ্টার পাণ্ডে ঠিকই ধরেছেন মনে হয়! নকুলেশবাবু, আপনি ছবি তুলেছিলেন?'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। ছবিখানি ভাল হয়েছিল। তিন কপি ছেপেছিলাম। তার মধ্যে এক কপি মহীধরবাবু নিয়েছিলেন—'

উষানাথবাবু গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'আমিও একখানা কিনেছিলাম।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার ছবিখানা আছে তো?'

উষানাথবাবু বলিলেন, 'কি জানি। এল্‌বামে রেখেছিলাম, তারপব আর দেখি নি। আছে নিশ্চয়।'

'আর তৃতীয় ছবিটি কে নিয়েছিলেন, নকুলেশবাবু?'

'প্রোফেসর সোম।'

আমরা সকলে সোমের পানে তাকাইলাম। তিনি এতক্ষণ নির্জীব ভাবে স্ত্রীর পাশে বসিয়াছিলেন, নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। সোম গৃহিণীর কিন্তু কোন প্রকার ভাবান্তর দেখা গেল না; তিনি কষ্টি-পাথরের যক্ষিণীমূর্তির ন্যায় অটল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার ছবিটা নিশ্চয় আছে!'

সোম উত্তপ্তমুখে বলিলেন, 'অ্যাঁ—তা—বোধ হয়—ঠিক বলতে পারি না—'

তাঁহার ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয়, তিনি এমন অসম্বৃত হইয়া পড়িলেন কেন?

তাঁহাকে সঙ্কটাবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন অমরেশবাবু, হাসিয়া বলিলেন, 'তা গিয়ে থাকে যাক গে, আর একখানা নেবেন। নকুলেশবাবু, আমারও কিন্তু একখানা চাই। আমিও গ্রুপে ছিলাম।'

নকুলেশবাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, 'ও ছবিটা আর পাওয়া যাবে না। নেগেটিভও খুঁজে পাচ্ছি না।'

'সে কি! কোথায় গেল নেগেটিভ।'

দেখিলাম, ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নকুলেশবাবুর পানে চাহিয়া আছে। তিনি বলিলেন, 'আমার ষ্টুডিওতে অন্যান্য নেগেটিভের সঙ্গে ছিল। আমি দিন দুয়েকের জন্যে কলকাতা গিয়েছিলাম, ষ্টুডিও বন্ধ ছিল; ফিরে এসে আর সেটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'ভাল করে খুঁজে দেখবেন। নিশ্চয়ই কোথাও আছে, যাবে কোথায়।'

এ প্রসঙ্গ লইয়া আর কোনও কথা হইল না। এদিকে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। আমরা গাত্রোত্থানের উদ্যোগ করিলাম, কারণ সূর্যাস্তের পর ব্যোমকেশকে বাহিরে রাখা নিরাপদ নয়।

এই সময় দেখিলাম একটি প্রেতাকৃতি লোক কখন আসিয়া মহীধরবাবুর পাশে দাঁড়াইয়াছে এবং নিম্নস্বরে তাঁহার সহিত কথা করিতেছে। লোকটি যে নিমন্ত্রিত অতিথি নয় তাহা তাহার বেশবাস দেখিয়াই অনুমান করা যায়। দীর্ঘ কঙ্কালসার দেহে আধ-ময়লা ধুতি ও সুতির কামিজ, চক্ষু এবং গণ্ডস্থল কোটরপ্রবিষ্ট, যেন মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ। তবু লোকটি যে ভদ্রশ্রেণীর তাহা বোঝা যায়।

মহীধরবাবু আমার অনতিদূরে উপবিষ্ট ছিলেন, তাই তাঁহাদের কথাবার্তা কানে আসিল। মহীধরবাবু একটু অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, 'আবার কি চাই বাপু? এই তো পরশু তোমাকে টাকা দিয়েছি।'

লোকটি ব্যগ্র-বিহ্বল স্বরে বলিল, 'আজ্ঞে আমি টাকা চাই না। আপনার একটা ছবি এঁকেছি তাই দেখাতে এনেছিলাম।'

'আমার ছবি!'

লোকটির হাতে এক তা পাকানো কাগজ ছিল, সে তাহা খুলিয়া মহীধরবাবুর চোখের সামনে ধরিল।

মহীধরবাবু সবিস্ময়ে ছবির পানে চাহিয়া রহিলেন। আমারও কৌতূহল হইয়াছিল, উঠিয়া গিয়া মহীধরবাবুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইলাম।

ছবি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শাদা কাগজের উপর ক্রেয়নের আঁকা ছবি, মহীধরবাবুর বুক পর্যন্ত প্রতিকৃতি; পাকা হাতের নিঃসংশয় কয়েকটি রেখায় মহীধরবাবুর অবিকল চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমার দেখাদেখি রজনীও আসিয়া পিতার পিছনে দাঁড়াইল এবং ছবি দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল, 'বাঃ! কি সুন্দর ছবি!'

তখন আরও কয়েকজন আসিয়া জুটিলেন। ছবিখানা হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল এবং সকলের মুখেই প্রশংসা গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চিত্রকর অদূরে দাঁড়াইয়া গদগদ মুখে দুই হাত ঘষিতে লাগিল।

মহীধরবাবু তাহাকে বলিলেন, 'তুমি তো খাসা ছবি আঁকতে পার! তোমার নাম কি?'

চিত্রকর বলিল, 'আজ্ঞে, আমার নাম ফাল্গুনী পাল।'

মহীধরবাবু পকেট হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, 'বেশ বেশ! ছবিখানি আমি নিলাম। এই নাও তোমার পুরস্কার।

ফাল্গুনী পাল কাঁকড়ার মত হাত বাড়াইয়া, তৎক্ষণাৎ নোট পকেটস্থ করিল।

পুরন্দর পাণ্ডে ললাট কুঞ্চিত করিয়া ছবিখানা দেখিতেছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলিয়া ফাল্গুনীকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি ওঁর ছবি আঁকলে কি করে? ফটো থেকে?

ফাল্গুনী বলিল, 'আজ্ঞে না। ওঁকে পরশুদিন একবার দেখেছিলাম—তাই—'

'একবার দেখেছিলে তাতেই ছবি এঁকে ফেললে ?'

ফাল্গুনী আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আমি পারি। আপনি যদি হুকুম দেন আপনার ছবি এঁকে দেব।'

পাণ্ডে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা বেশ। তুমি যদি আমার ছবি এঁকে আনতে পার, আমিও তোমাকে দশ টাকা বক্‌শিস্ দেব !'

ফাল্গুনী পাল সবিনয়ে সকলকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। পাণ্ডে ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'দেখা যাক। আমি ওঁদের পিক্‌নিক্ গ্রুপে ছিলাম না।'

ব্যোমকেশ অনুমোদনসূচক ঘাড় নাড়িল।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল। মহীধরবাবুর মোটর আমাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল। সোম-দম্পতিও আমাদের সঙ্গে ফিরিলেন।

৩

রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় আমরা তিন জন বসিবার ঘরে দোরতাড়া বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম। নৈশ আহারের এখনও বিলম্ব আছে। ব্যোমকেশ আরাম কেদারায় বসিয়া বলবর্ধক ডাক্তারি মন্ড চুমুক দিয়া পান করিতেছে; সত্যবতী তাহার পাশে একটা চেয়ারে র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বসিয়াছে। আমি সম্মুখে বসিয়া মাঝে মাঝে পকেট হইতে সিগারেটের ডিবা বাহির করিতেছি, আবার রাখিয়া দিতেছি। ব্যোমকেশের গঞ্জনা খাইবার আর ইচ্ছা নাই। চায়ের জলসার আলোচনাই হইতেছে।

আমি বলিলাম, 'আমরা শিল্প-সাহিত্যের কত আদর করি ফাল্গুনী পাল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। লোকটা সত্যিকার গুণী, অথচ পেটের দায়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।'

ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক ছিল, বলিল, 'পেটের দায়ে ভিক্ষে করছে তুমি জানলে কি করে?'

বলিলাম, 'ওর চেহারা আর কাপড়-চোপড় দেখে পেটের অবস্থা আন্দাজ করা শক্ত নয়।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, 'শক্ত নয় বলেই তুমি ভুল আন্দাজ করেছ। তুমি সাহিত্যিক, শিল্পীর প্রতি তোমার সহানুভূতি স্বাভাবিক। কিন্তু ফাল্গুনী পালের শারীরিক দুর্গতির কারণ অন্নাভাব নয়। আসলে খাদ্যের চেয়ে পানীয়ের প্রতি তার টান বেশী।'

'অর্থাৎ মাতাল? তুমি কি করে বুঝলে?'

'প্রথমত, তার ঠোঁট দেখে। মাতালের ঠোঁট যদি লক্ষ্য কর, দেখবে বৈশিষ্ট্য আছে; একটু ভিজে ভিজে, একটু শিথিল—ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু দেখলে বুঝতে পারি। দ্বিতীয়ত, ফাল্গুনী যদি ক্ষুধার্ত হ'ত তা হলে খাদ্যদ্রব্যগুলোর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করত, টেবিলের উপর তখনও প্রচুর খাবার ছিল। কিন্তু ফাল্গুনী সেদিকে একবার ফিরেও তাকাল না। তৃতীয়তঃ, আমার পাশ দিয়ে যখন চলে গেল তখন তার গায়ে মদের গন্ধ পেলাম। খুব স্পষ্ট নয়, তবু মদের গন্ধ।' বলিয়া ব্যোমকেশ নিজের বল-বর্ধক ঔষধটি তুলিয়া লইয়া এক চুমুক পান করিল।

সত্যবতী বলিল, 'যাক গে, মাতালের কথা শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু ছবি চুরির এ কি ব্যাপার গা? আমি ত কিছু বুঝতেই পারলাম না। মিছিমিছি ছবি চুরি করবে কেন?'

ব্যোমকেশ কতকটা আপন মনেই বলিল, হয়তো পাণ্ডেসাহেব ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু—যদি তা না হয় তা হলে ভাববার কথা।...পিকনিকে গ্রুপ ছবি তোলা হয়েছিল। আজ চায়ের পার্টিতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই পিক্‌নিকে ছিলেন—পাণ্ডে ছাড়া।...ছবির তিনটে কপি ছাপা হয়েছিল; তার মধ্যে একটা চুরি গেছে, বাকি দুটো আছে কিনা জানা যায়নি—নেগেটিভটাও পাওয়া যাচ্ছে না।—' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ইনি ছবির কথায় এমন ঘাবড়ে গেলেন কেন বোঝা গেল না।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর আমি বলিলাম, 'কেউ যদি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিটা সরিয়ে থাকে তবে সে উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উদ্দেশ্য কি একটা অজিত? কে কোন্ মতলবে

ফিরছে তা কি এত সহজে ধরা যায়? গহনা কর্মণো গতিঃ। সেদিন একটা মার্কিন পত্রিকায় দেখেছিলাম, ওদের চিড়িয়াখানাতে এক বানর-দম্পতি আছে। পুরুষ বাঁদরটা এমনি হিংসুটে, কোনও পুরুষ-দর্শক খাঁচার কাছে এলেই বৌকে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে।'

সত্যবতী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'তোমার যত সব আষাঢ়ে গল্প। বাঁদরের কখনও এত বুদ্ধি হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা বুদ্ধি নয়, হৃদয়াবেগ; সরল ভাষায় যৌন ঈর্ষা। মানুষের মধ্যেও যে ও-বস্তুটি আছে আশা করি তা অস্বীকার করবে না। পুরুষের মধ্যে ত আছেই, মেয়েদের মধ্যে আরও বেশী আছে। আমি যদি মহীধরবাবুর মেয়ে রজনীর সঙ্গে বেশী মাখামাখি করি তোমার ভাল লাগবে না।'

সত্যবতী র‍্যাপারের একটা প্রান্ত ঠোঁটের উপর ধরিয়া নত চক্ষে চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'কিন্তু এই ঈর্ষার সঙ্গে ছবি চুরির সম্বন্ধটা কি?'

'যেখানে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আছে সেইখানেই এ ধরনের ঈর্ষা থাকতে পারে।' বলিয়া ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বমুখে ছাদের পানে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম, 'মোটিভ খুব জোরালো মনে হচ্ছে না। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে না কি?'

'পারে। চিত্রকর ফাল্গুনী পাল চুরি করে থাকতে পারে। একটা মানুষকে একবার মাত্র দেখে সে ছবি আঁকতে পারে, তার এই দাবি সম্ভবত মিথ্যে। ফটো দেখে ছবি সহজেই আঁকা যায়। ফাল্গুনী সকলের চোখে চমক লাগিয়ে দিয়ে বেশী টাকা রোজগার করবার চেষ্টা করছে কিনা কে জানে!'

'হুঁ। আর কিছু?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'ফটোগ্রাফার নকুলেশবাবু স্বয়ং ছবি চুরি করে থাকতে পারেন।'

'নকুলেশবাবুর স্বার্থ কি?'

'তাঁর ছবি আরও বিক্রি হবে এই স্বার্থ।' বলিয়া ব্যোমকেশ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

'এটা সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?'

'ব্যবসাদারের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। আমেরিকায় ফসলের দাম বাড়াবার জন্য ফসল পুড়িয়ে দেয়।'

'আচ্ছা। আর কেউ?'

'ঐ দলের মধ্যে হয়তো এমন কেউ আছে যে নিশ্চিহ্নভাবে নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চায়—'

'মানে—দাগী আসামী?'

এই সময়ে ঘরের বন্ধ দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল। আমি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। অধ্যাপক সোম গরম ড্রেসিং গাউন পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে স্বাগত করিলাম। আমরা আসা অবধি তিনি প্রায় প্রত্যহ এই সময় একবার নামিয়া আসেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব হয়; তার পর আহারের সময় হইলে তিনি চলিয়া যান। তাঁহার গৃহিণী দিনের বেলা দু'একবার আসিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্যবতীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিবার আগ্রহ তাঁহার দেখা যায় নাই। সত্যবতীও মহিলাটির প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে নাই।

সোম আসিয়া বসিলেন। তাঁহাকে একটি সিগারেট দিয়া নিজে একটি ধরাইলাম। ব্যোমকেশের সাক্ষাতে ধূমপান করিবার এই একটা সুযোগ; সে খিঁচাইতে পারিবে না।

সোম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ পার্টি কেমন লাগল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ লাগল। সকলেই বেশ কর্ষিতচিত্ত ভদ্রলোক বলে মনে হ'ল।'

সোম সিগারেটে একটা টান দিয়া বলিলেন, 'বাইরে থেকে সাধারণত তাই মনে হয়। কিন্তু সেকথা আপনার চেয়ে বেশী কে জানে? মিসেস্ বক্সী, আজ যাঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কাকে ভাল লাগল বলুন।'

সত্যবতী নিঃসংশয়ে বলিল, 'রজনীকে। ভারি সুন্দর স্বভাব, আমার বড্ড ভাল লেগেছে।'

সোমের মুখে একটু অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল। সত্যবতী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলিল, 'যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি মিষ্টি কথা; আর ভারি

বুদ্ধিমতী।—আচ্ছা, মহীধরবাবু এখনও মেয়ের বিয়ে কেন দিচ্ছেন না? ওঁর তো টাকার অভাব নেই।'

দ্বারের নিকট হইতে একটি তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিলাম—

'বিধবা! বিধবা! বিধবাকে কোন্ হিঁদুর ছেলে বিয়ে করবে?' মালতী দেবী কখন দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন জানিতে পারি নাই। সংবাদটি যেমন অপ্রত্যাশিত, সংবাদ-দাত্রীর আবির্ভাবও তেমনি বিস্ময়কর। হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। মালতী দেবী ঈর্ষাতিক্ত নয়নে আমাদের একে একে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বলিলেন, 'বিশ্বাস হচ্চে না? উনি জানেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন। এখানে সবাই জানে। অতি বড় বেহায়া না হলে বিধবা মেয়ে আইবুড়ো সেজে বেড়ায় না। কিন্তু দু'কান কাটার কি লজ্জা আছে? অত যে ছলা-কলা ওসব পুরুষ ধরবার ফাঁদ।'

মালতী দেবী যেমন আচম্বিতে আসিয়াছিলেন তেমনি অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন। সিঁড়িতে তাঁর দুম্ দুম্ পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অভিভূত হইয়াছিলেন অধ্যাপক সোম! তিনি লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। শেষে তিনি বিড়ম্বিত মুখ তুলিয়া দীনকণ্ঠে বলিলেন, 'আমাকে আপনারা মাপ করুন। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় কোথাও পালিয়ে যাই—' তাঁর স্বর বুজিয়া গেল।

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে প্রশ্ন করিল, 'রজনী সত্যিই বিধবা?'

সোম ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হ্যাঁ। চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়। মহীধরবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কৃতি ছাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের দু'দিন পরে প্লেনে চড়ে সে বিলেত যাত্রা করে; মহীধরবাবুই জামাইকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে বিলেত পর্যন্ত পৌঁছল না; পথেই বিমান-দুর্ঘটনা হয়ে মারা গেল। রজনীকে কুমারী বলা চলে।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি সোমকে আর একটি সিগারেট দিলাম এবং দেশলাই জ্বালাইয়া ধরিলাম। সিগারেট ধরাইয়া সোম বলিলেন, 'আপনারা আমার পারিবারিক পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছেন।

আমার জীবনের ইতিহাসও অনেকটা মহীধরবাবুর জামাইয়ের মত। গরীবের ছেলে ছিলাম এবং ভাল ছাত্র ছিলাম। বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় বিলেত যাই। কিন্তু উপসংহারটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের হল। আমি বিদ্যালাভ করে ফিরে এলাম এবং কলেজের অধ্যাপক হলাম। কিন্তু বেশীদিন টিকতে পারলাম না। কাজ ছেড়ে দিয়ে আজ সাত বছর এখানে বাস করছি। অন্ন-বস্ত্রের অভাব নেই; আমার স্ত্রীর অনেক টাকা।'

কথাগুলিতে অন্তরের তিক্ততা ফুটিয়া উঠিল। আমি একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাজ ছেড়ে দিলেন কেন?'

সোম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'লজ্জায়। স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে স্ত্রীকে ঘরে বন্ধ করে রাখা যায় না—অথচ—। মাঝে মাঝে ভাবি, বিমান দুর্ঘটনাটা যদি রজনীর স্বামীর না হয়ে আমার হত সব দিক দিয়েই সুরাহা হত।'

সোম দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। ব্যোমকেশ পিছন হইতে বলিল, 'প্রোফেসর সোম, যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করি। যে গ্রুপ ছবিটা কিনেছিলেন সেটা কোথায়?'

সোম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'সেটা আমার স্ত্রী কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তাতে আমি আর রজনী পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম।'

সোম ধীরপদে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে আহারে বসিয়া বেশী কথাবার্তা হইল না। হঠাৎ এক সময়ে সত্যবতী বলিয়া উঠিল, 'যে যাই বলুক, রজনী ভারি ভাল মেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছে, বাপ যদি সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতে চান তাতে দোষ কি?'

ব্যোমকেশ একবার সত্যবতীর পানে তাকাইল, তারপর নির্লিপ্ত স্বরে বলিল, 'আজ পার্টিতে একটা সামান্য ঘটনা লক্ষ্য করলাম, তোমাদের বোধ হয় চোখে পড়ে নি। মহীধরবাবু তখন ছবি চুরির গল্প আরম্ভ করেছেন, সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে। দেখলাম, ডাক্তার ঘটক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, রজনী চুপি চুপি তার কাছে গিয়ে তার পকেটে একটা চিঠির মতন ভাঁজ করা কাগজ ফেলে দিলে। দু'জনের মধ্যে একটা চকিত চাউনি খেলে গেল। তারপর রজনী সেখান থেকে সরে এল। আমার বোধ হয় আমি ছাড়া এ দৃশ্য আর কেউ লক্ষ্য করে নি। মালতী দেবীও না।'

৪

দিন পাঁচ ছয় কাটিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশের শরীর এই কয়দিনে আরও সারিয়াছে। তাহার আহার্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে; সত্যবতী তাহাকে দিনে দুইটি সিগারেট খাইবার অনুমতি দিয়াছে। আমি নিত্য গুরুভোজনের ফলে দিন দিন খোদার খাসী হইয়া উঠিতেছি, সত্যবতীর গায়েও গত্তি লাগিয়াছে। এখন আমরা প্রত্যহ বৈকালে ব্যোমকেশকে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় পাদচারণ করি, কারণ হাওয়া বদলের ইহা একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সকলেই খুশী।

একদিন আমরা পথ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, অধ্যাপক সোম আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, বলিলেন, 'চলুন, আজ আমিও আপনাদের সহযাত্রী।'

সত্যবতী একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, 'মিসেস্ সোম কি—?'

সোম প্রফুল্ল স্বরে বলিলেন, 'তাঁর সর্দি হয়েছে। শুয়ে আছেন।'

সোম মিশুক লোক, কেবল স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে একটু নির্জীব হইয়া পড়েন। আমরা নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ছবি চুরির প্রসঙ্গ আপনা হইতেই উঠিয়া পড়িল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা বলুন দেখি, ঐ ছবিখানা কাগজে বা পত্রিকায় ছাপানোর কোনও প্রস্তাব হয়েছিল কি?'

সোম চকিতে একবার ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, 'কৈ আমি ত কিছু জানি না। তবে নকুলেশবাবু মাঝে কলকাতা গিয়েছিলেন বটে। কিন্তু আমাদের না জানিয়ে তিনি ছবি ছাপতে দেবেন কি? মনে হয় না। বিশেষত ডেপুটি উষানাথবাবু জানতে পারলে ভারি অসন্তুষ্ট হবেন।'

'উষানাথবাবু অসন্তুষ্ট হবেন কেন?'

'উনি একটু অদ্ভুত গোছের লোক। বাইরে বেশ গ্রাম্ভারি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীরু প্রকৃতি। বিশেষত ইংরেজ মনিবকে * যমের মত ভয় করেন।

* যে সময়ের গল্প তখনও ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয় নাই।

সাহেবরা বোধ হয় চায় না যে একজন হাকিম সাধারণ লোকের সঙ্গে ফটো তোলাবে, তাই উষানাথবাবুর ফটো তোলাতে ঘোর আপত্তি। মনে আছে, পিক্‌নিকের সময় তিনি প্রথমটা ফটোর দলে থাকতে চান নি, অনেক বলে-কয়ে রাজী করাতে হয়েছিল। এ ছবি যদি কাগজে ছাপা হয় নকুলেশবাবুর কপালে দুঃখ আছে।'

ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম সে মনে মনে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'উষানাথবাবু কি সব সময়েই কালো চশমা পরে থাকেন?'

সোম বলিলেন, 'হ্যাঁ। উনি বছর দেড়েক হ'ল এখানে বদলি হয়ে এসেছেন, তার মধ্যে আমি ওঁকে কখনও বিনা চশমায় দেখি নি। হয় ত চোখের কোনও দুর্বলতা আছে; আলো সহ্য করতে পারেন না।'

ব্যোমকেশ উষানাথবাবু সম্বন্ধে আর কোনও প্রশ্ন করিল না। হঠাৎ বলিল, 'ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার লোকটি কেমন?'

সোম বলিলেন, 'চতুর ব্যবসাদার, ঘটে বুদ্ধি আছে। মহীধরবাবুকে খোসামোদ করে চলেন, শুনেছি তাঁর কাছে টাকা ধার নিয়েছেন।'

'তাই নাকি! কত টাকা?'

'তা ঠিক জানি না। তবে মোটা টাকা।'

এই সময় সামনে ফটফট শব্দ শুনিয়া দেখিলাম একটি মোটর-বাইক আসিতেছে। আরও কাছে আসিলে চেনা গেল, আরোহী ডি-এস-পি পুরন্দর পাণ্ডে। তিনিও আমাদের চিনিয়াছিলেন, মোটর-বাইক থামাইয়া সহাস্যমুখে অভিবাদন করিলেন।

কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ফাল্গুনী পাল আপনার ছবি এঁকেছে?'

পাণ্ডে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'তাজ্জব ব্যাপার মশাই, পর দিনই ছবি নিয়ে হাজির। একেবারে হুবহু ছবি এঁকেছে। অথচ আমার ফটো তার হাতে যাবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। সত্যি গুণী লোক। দশ টাকা খসাতে হল।'

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, 'কোথায় থাকে সে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আর বলবেন না। অতবড় গুণী কিন্তু একেবারে হতভাগা। পাঁড় নেশাখোর—মদ গাঁজা গুলী কোকেন কিছুই বাদ যায় না। মাসখানেক এখানে এসেছে। এখানে এসে যেখানে সেখানে পড়ে থাকত, কোনোও দিন কারুর বারান্দায়, কোনোও দিন কারুর খড়ের গাদায় রাত কাটাত। মহীধরবাবু দয়া করে নিজের বাগানে থাকতে দিয়েছেন। ওঁর বাগানের কোণে একটা মেটে ঘর আছে, দু'দিন থেকে সেখানেই আছে।'

হতভাগ্য এবং চরিত্রহীন শিল্পীর যে-দশা হয় ফাল্গুনীরও তাহাই হইয়াছে। তবু কিছুদিনের জন্যও সে একটা আশ্রয় পাইয়াছে জানিয়া মনটা আশ্বস্ত হইল।

পাণ্ডে আবার গাড়িতে ষ্টার্ট দিবার উপক্রম করিলে সোম বলিলেন, 'আপনি এদিকে চলেছেন কোথায় ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'মহীধরবাবুর বাড়ির দিকেই যাচ্ছি। নকুলেশবাবুর মুখে শুনলাম তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই বাড়ি যাবার পথে তাঁর খবর নিয়ে যাব।'

'কি অসুখ ?'

'সামান্য সর্দিকাশি। কিন্তু ওঁর হাঁপানির ধাত।'

সোম বলিলেন, 'তাই ত, আমারও দেখতে যাওয়া উচিত। মহীধরবাবু আমাকে বড়ই স্নেহ করেন—'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বেশ ত, আমার গাড়ির পিছনের সীটে উঠে বসুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক। ফেরবার সময় আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

'তা হলে ত ভালই হয়', বলিয়া সোম মোটর বাইকের পিছনে গদি-আঁটা আসনটিতে বসিয়া পাণ্ডের কোমর জড়াইয়া লইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, মহীধরবাবুকে বলে দেবেন আমরা কাল বিকেলে যাব।'

'আচ্ছা। নমস্কার।'

মোটর-বাইক দুই জন আরোহী লইয়া চলিয়া গেল। আমরাও বাড়ির দিকে ফিরিলাম। লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশ আপন মনে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

বাড়ি ফিরিয়া চা পান করিতে বসিলাম। ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। দরজা খোলা ছিল; সিঁড়ির উপর ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ব্যোমকেশ চকিত হইয়া খাটো গলায় বলিল, 'অধ্যাপক সোম কোথায় গেছেন এ প্রশ্নের যদি জবাব দেবার দরকার হয়, ব'লো তিনি মিষ্টার পাণ্ডের বাড়িতে গেছেন।'

কথাটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। মালতী দেবী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সর্দিতে তাঁহার মুখখানা আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু রক্তাভ; তিনি ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সত্যবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আসুন মিসেস সোম।'

মালতী দেবী ধরা ধরা গলায় বলিলেন, 'না, আমার শরীর ভাল নয়। উনি আপনাদের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন, কোথায় গেলেন?'

ব্যোমকেশ দ্বারের কাছে আসিয়া সহজ স্বরে বলিল, রাস্তায় পাণ্ডে সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি প্রোফেসর সোমকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।'

মালতী দেবী বিস্ময়ভরে বলিলেন, 'পুলিসের পাণ্ডে? ওঁর সঙ্গে তাঁর কি দরকার?'

ব্যোমকেশ সরলভাবে বলিল, 'তা তো কিছু শুনলাম না। পাণ্ডে বললেন, চলুন আমার বাড়িতে চা খাবেন। হয় ত কোনও কাজের কথা আছে।'

মালতী দেবী আমাদের তিন জনের মুখ ভাল করিয়া দেখিলেন, একটা গুরুভার নিশ্বাস ফেলিলেন, তার পর আর কোনও কথা না বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম।

ব্যোমকেশ আমাদের পানে চাহিয়া একটু লজ্জিত ভাবে হাসিল, বলিল, 'ডাহা মিথ্যে কথা বলতে হ'ল। কিন্তু উপায় কি? বাড়িতে দাম্পত্য-দাঙ্গা হওয়াটা কি ভাল?'

সত্যবতী বাঁকা স্বরে বলিল, 'তোমাদের সহানুভূতি কেবল পুরুষের দিকে। মিসেস সোম যে সন্দেহ করেন সে নেহাত মিছে নয়।'

ব্যোমকেশেরও স্বর গরম হইয়া উঠিল, 'আর তোমাদের সহানুভূতি কেবল মেয়েদের দিকে। স্বামীর ভালবাসা না পেলে তোমরা হিংসেয় চৌচির হয়ে যাও, কিন্তু স্বামীর ভালবাসা কি করে রাখতে হয় তা জান না।—যাক, অজিত, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই; বাইরের বারান্দায় পাহারা দিতে হবে। সোম ফিরলেই তাকে চেতিয়ে দেওয়া দরকার, নৈলে মিথ্যে কথা যদি ধরা পড়ে যায় তা হলে সোম ত যাবেই সেই সঙ্গে আমাদেরও অশেষ দুর্গতি হবে।'

আমার কোনোই আপত্তি ছিল না। বাহিরের বারান্দায় একটা চেয়ার পড়িয়া থাকিত, তাহাতে বসিয়া মনের সুখে সিগারেট টানিতে লাগিলাম। বাহিরে একটু ঠাণ্ডা বেশী, কিন্তু আলোয়ান গায়ে থাকিলে কষ্ট হয় না।

সোম ফিরিলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। পাণ্ডের মোটর ফট্ ফট্ শব্দে ফটকের বাহিরে দাঁড়াইল, সোমকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তিনি বারান্দায় উঠিলে আমি বলিলাম, 'শুনে যান। কথা আছে।'

বসিবার ঘরে ব্যোমকেশ একলা ছিল। সোমের মুখ দেখিলাম, গম্ভীর ও কঠিন। ব্যোমকেশ বলিল, 'মহীধরবাবু কেমন আছেন?'

সোম সংক্ষেপে বলিলেন, 'ভালই।'

'ওখানে আর কেউ ছিল নাকি?'

'শুধু ডাক্তার ঘটক।'

ব্যোমকেশ তখন মালতী-সংবাদ সোমকে শুনাইল। সোমের গম্ভীর মুখে একটু হাসি ফুটিল। তিনি বলিলেন, 'ধন্যবাদ।'

৫

পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশের সময় লক্ষ্য করিলাম দাম্পত্য কলহ কেবল বাড়ির উপরতলায় আবদ্ধ নাই, নীচের তলায় নামিয়া আসিয়াছে। সত্যবতীর মুখ ভারী, ব্যোমকেশের অধরে বঙ্কিম কঠিনতা। দাম্পত্য কলহ বোধ করি সর্দিকাশির মতই ছোঁয়াচে রোগ।

কি করিয়া দাম্পত্য কলহের উৎপত্তি হয়, কেমন করিয়া তাহার নিবৃত্তি হয়, এসব গূঢ় রহস্য কিছু জানি না। কিন্তু জিনিসটা নূতন নয়, ইতিপূর্বে

দেখিয়াছি। ঋষি-শ্রাদ্ধের ন্যায় মহা ধূমধামের সহিত আরম্ভ হইয়া অচিরাৎ প্রভাতের মেঘ-ডম্বরবৎ শূন্যে মিলাইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত' চল আজ সকালবেলা একটু বেরুনো যাক্।'

বলিলাম, 'বেশ চল। সত্যবতী তৈরি হয়ে নিক।'

সত্যবতী বিরসমুখে বলিল, 'আমার বাড়িতে কাজ আছে। সকাল বিকাল টো টো করে বেড়ালে চলে না।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া শালটা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, 'আমরা দু'জনে যাব এই প্রস্তাবই আমি করেছিলাম। চল, মিছে বাড়িতে বসে থেকে লাভ নেই।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের পায়ের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, 'যার রোগা শরীর তার মোজা পায়ে দিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত।' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি হাসি চাপিতে না পারিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম। কয়েক মিনিট পরে ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। তাহার ললাটে গভীর ভ্রূকুটি, কিন্তু পায়ে মোজা।

রাস্তায় বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের যে কোনোও বিশেষ গন্তব্য স্থান আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই! ভাবিয়াছিলাম হাওয়া-বদলকারীর স্বাভাবিক পরিব্রজন-স্পৃহা তাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু কিছু দূর যাইবার পর একটা খালি রিক্শা দেখিয়া সে তাহাতে উঠিয়া বসিল। আমিও উঠিলাম ব্যোমকেশ বলিল, 'ডেপুটি উষানাথবাবুকা মোকাম চলো।'

রিক্শা চলিতে আরম্ভ করিলে আমি বলিলাম, 'হঠাৎ উষানাথবাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ রবিবার, তিনি বাড়ি থাকবেন। তাঁকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।'

আধ মাইল পথ চলিবার পর আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি ছবি চুরির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ মনে হচ্ছে। সত্যিই কি ওতে গুরুতর কিছু আছে?'

সে বলিল, 'সেইটেই আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।'

আরও আধ মাইল পথ উত্তীর্ণ হইয়া উষানাথবাবুর বাড়িতে পৌঁছান গেল। হাকিম পাড়ায় বাড়ি, পাঁচিল দিয়া ঘেরা। ফটকের কাছে রিক্‌শাওয়ালাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমেই চমক লাগিল, বাড়ির সদরে কয়েকজন পুলিসের লোক দাঁড়াইয়া আছে। তার পর দেখিলাম ডি-এস-পি পুরন্দর পাণ্ডের মোটর-বাইক রহিয়াছে।

উষানাথ ও পাণ্ডে সদর বারান্দায় ছিলেন। আমাদের দেখিয়া পাণ্ডে সবিস্ময়ে বলিলেন, 'একি, আপনারা!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ রবিবার, তাই বেড়াতে এসেছিলাম।'

উষানাথ হিমশীতল হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন। কালরাত্রে বাড়ীতে চুরি হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি? কি চুরি গেছে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সেটা এখনও জানা যায় নি। রাত্রে এঁরা দোতলায় শোন্, নীচে কেউ থাকে না। ঘর বন্ধ থাকে। কাল রাত্রে আপিস-ঘরে চোর ঢুকে আলমারি খোলবার চেষ্টা করেছিল। একটা পর-চাবি তালায় ঢুকিয়েছিল, কিন্তু সেটা বের করতে পারেনি।'

'বটে! আলমারিতে কি ছিল?'

উষানাথবাবু বলিলেন, 'সরকারী দলিলপত্র ছিল, আর আমার স্ত্রীর গয়নার বাক্স ছিল। ষ্টিলের আলমারি। লোহার সিন্দুক বলতে পারেন।'

উষানাথবাবুর চোখে কালো চশমা, চোখ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, তিনি ভয় পাইয়াছেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'তা হলে চোর কিছু নিয়ে যেতে পারেনি?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সেটা আলমারি না খোলা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। একটা চাবিওয়ালা ডাকতে পাঠিয়েছি।'

'হুঁ। চোর ঘরে ঢুকল কি করে?'

'কাঁচের জানালার একটা কাঁচ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলেছে। আসুন না দেখবেন।'

উষানাথবাবুর আপিস-ঘরে প্রবেশ করিলাম। মাঝারি আয়তনের ঘর,

একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, ষ্টিলের আলমারি, দেওয়ালে ভারত-সম্রাটের ছবি—এ ছাড়া আর কিছু নাই। ব্যোমকেশ কাঁচ-ভাঙা জানালা পরীক্ষা করিল; আলমারির চাবি ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চাবি ঘুরিল না। এই চাবিটি ছাড়া চোর নিজের আগমনের আর কোনোও নিদর্শন রাখিয়া যায় নাই। আপিস-ঘরের পাশেই ড্রয়িং-রুম, মাঝে দরজা। আমরা সেখানে গিয়া বসিলাম। আলমারিটা খোলা না হওয়া পর্যন্ত কিছু চুরি গিয়াছে কিনা জানা যাইবে না। উষানাথবাবু চায়ের প্রস্তাব করিলেন, আমরা মাথা নাড়িয়া প্রত্যাখান করিলাম।

ড্রয়িং-রুমটি মামুলি ভাবে সাজান গোছান। এখানেও দেওয়ালে ভারত-সম্রাটের ছবি। এক কোণে একটি রেডিও যন্ত্র। চেয়ারগুলির পাশে ছোট ছোট নীচু টেবিল; তাহাদের কোনোটার উপর পিতলের ফুলদানী, কোনোটার উপর ছবির এল্‌বাম। দামী জিনিস কিছু নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চোর বোধ হয় এ ঘরে ঢোকে নি।'

উষানাথবাবু বলিলেন, 'এ ঘরে চুরি করবার মত কিছু নেই।' বলিয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। চোখের কাল চশমা ক্ষণেকের জন্য তুলিয়া কোণের রেডিও-যন্ত্রটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর চশমা নামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমার পরী! পরী কোথায় গেল!'

আমরা সমস্বরে বলিলাম, 'পরী!'

উষানাথবাবু রেডিওর কাছে গিয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে বলিলেন, 'একটা রূপালী গিল্‌টি-করা ছোট্ট পরী—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী আমাকে উপহার দিয়েছিলেন—সেটা রেডিওর ওপর রাখা থাকত। নিশ্চয় চোরে নিয়ে গেছে।' আমরাও উঠিয়া গিয়া দেখিলাম। রেডিও যন্ত্রের উপর আধুলির মত একটা স্থান সম্পূর্ণ শূন্য। পরী ঐ স্থানে অবস্থান করিতেন সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চোর হয়ত নেয় নি। আপনার ছেলে খেলা করবার জন্যে নিয়ে থাকতে পারে। একবার খোঁজ করে দেখুন না।'

উষানাথ বাবু ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়া বলিলেন, 'খোকা সভ্য ছেলে, সে কখনও কোনোও জিনিসে হাত দেয় না। যাহোক, আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ পাণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাউকে সন্দেহ করেন নাকি?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সন্দেহ—না, সে রকম কিছু নয়। তবে একটা আরদালি বলছে, কাল রাত্রি আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় একটা পাগলাটে গোছের লোক ডেপুটি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ডেপুটি বাবু দেখা করেন নি, আরদালি বাইরে থেকেই তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। আরদালি লোকটার যে-রকম বর্ণনা দিলে তাতে ত মনে হয়—'

'ফাল্গুনী পাল?'

'হ্যাঁ। একজন সাব্-ইন্‌সপেক্টরকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি।'

উষানাথবাবু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া জানাইলেন তাঁহার স্ত্রী-পুত্র পরীর কোনোও খবরই রাখেন না। নিশ্চয় চোর আর কিছু না পাইয়া রৌপ্যভ্রমে পরীকে লইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ভ্রূকুঁচকাইয়া বসিয়া ছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, 'ভাল কথা, সেই ছবিটা আছে কিনা দেখেছিলেন কি?'

'কোন্ ছবি?'

'সেই যে একটা গ্রুপ-ফটোর কথা মহীধরবাবুর বাড়িতে হয়েছিল?'

'ও—না, দেখা হয় নি। ঐ যে আপনার পাশে এল্‌বাম রয়েছে, দেখুন না ওতেই আছে।'

ব্যোমকেশ এল্‌বাম লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহাতে উষানাথবাবুর পিতামাতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র সকলের ছবি আছে, এমন কি মহীধরবাবু ও রজনীর ছবিও আছে, কেবল উদ্দিষ্ট গ্রুপ-ফটোখানি নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'কৈ দেখছি না তো?'

'নেই!' উষানাথবাবু উঠিয়া আসিয়া নিজে এল্‌বাম দেখিলেন, কিন্তু ফটো পাওয়া গেল না। তিনি তখন বলিলেন 'কি জানি কোথায় গেল। কিন্তু এটা এমন কিছু দামী জিনিস নয়। আলমারি থেকে যদি দলিলপত্র কিংবা গয়নার বাক্স চুরি গিয়ে থাকে—'

ব্যোমকেশ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, 'আপনি চিন্তা করবেন না, চোর কিছুই চুরি করতে পারেনি। গয়নার বাক্স নিরাপদে আছে, এমন কি,

আপনার পত্নীও একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। আজ তা হলে আমরা উঠি। মিষ্টার পাণ্ডে, চোরের যদি সন্ধান পান আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

পাণ্ডে হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। আমরা বাহিরে আসিলাম; উষানাথ-বাবুও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ব্যোমকেশ উষানাথবাবুকে ইসারা করিয়া বারান্দার এক কোণে লইয়া গিয়া চুপিচুপি কিছুক্ষণ কথা বলিল। তার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চল।'

রিক্‌শাওয়ালা অপেক্ষা করিতেছিল; আমরা ফিরিয়া চলিলাম। ব্যোমকেশ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তার পর এক সময় বলিল, 'অজিত, উষানাথবাবু এক সময় চোখের চশ্‌মা তুলেছিলেন, তখন কিছু লক্ষ্য করেছিলে?'

'কৈ না। কি লক্ষ্য করব?'

'উষানাথবাবুর বাঁ চোখটা পাথরের।'

'তাই নাকি? কালো চশমার এই অর্থ?'

'হ্যাঁ। বছর তিনেক আগে ওঁর চোখের ভেতরে ফোড়া হয়, অস্ত্র করে চোখটা বাদ দিতে হয়েছিল। ওঁর সর্বদা ভয় সাহেবরা জানতে পারলেই ওঁর চাকরি যাবে।'

'আচ্ছা ভীতু লোক তো! এই কথাই বুঝি আড়ালে গিয়ে হচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

এই তথ্যের গুরুত্ব কতখানি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। উষানাথ-বাবু যদি কানা-ই হন তাহাতে পৃথিবীর কি ক্ষতিবৃদ্ধি?

রিক্‌শা ক্রমে বাড়ির নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, যাবার সময় তুমি প্রশ্ন করেছিলে, ছবি চুরির ব্যাপার গুরুতর কিনা। সে প্রশ্নের উত্তর এখন দেওয়া যেতে পারে। ব্যাপার গুরুতর।'

'সত্যি? কি করে বুঝলে?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, একটু মুচকি হাসিল।

৬

অপরাহ্ণে আমরা মহীধরবাবুর বাড়িতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সত্যবতী বলিল, 'ঠাকুরপো, টর্চ নিয়ে যেও। ফিরতে রাত করবে নিশ্চয়।'

আমি টর্চ পকেটে লইয়া বলিলাম, 'তুমি এবেলাও তা হলে বেরুচ্ছ না?'

সত্যবতী বলিল, 'না। ওপরতলায় একটা মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, কথা কইবার লোক নেই। তার কাছে দু'দণ্ড বসে দুটো কথা কইলেও তার মনটা ভাল থাকবে।'

বলিলাম, 'মালতী দেবীর প্রতি তোমার সহানুভূতি যে ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে।'

'কেন বাড়বে না? নিশ্চয় বাড়বে।'

'আর রজনীর প্রতি সহানুভূতি বোধ করি সেই অনুপাতে কমে যাচ্ছে?'

'মোটেই না, একটুও কমে নি। রজনীর দোষ কি? যত নষ্টের গোড়া এই পুরুষ জাতটা।'

তর্জন করিয়া বলিলাম, 'দেখ, জাত তুলে কথা বললে ভাল হবে না বলছি।'

সত্যবতী নাক সিঁটকাইয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

মহীধরবাবুর বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন সূর্যাস্ত হয় নাই বটে কিন্তু বাগানের মধ্যে ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে। খোলা ফটকে লোক নাই। রাত্রেও বোধ হয় ফটক খোলা থাকে, কিংবা গরু ছাগলের গতিরোধ করিবার জন্য আগড় লাগানো থাকে। মানুষের যাতায়াতে বাধা নাই।

বাড়ির সদর দরজা খোলা; কিন্তু বাড়িতে কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। দুই-তিন বার হ্রেষা-ধ্বনিবৎ গলা খাঁকারি দিবার পর একটি বৃদ্ধগোছের চাকর বাহির হইয়া আসিল। বলিল, 'কর্তাবাবু ওপরে শুয়ে আছেন। দিদিমণি বাগানে বেড়াচ্ছেন। আপনারা বসুন, আমি ডেকে আনছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দরকার নেই। আমরাই দেখছি।' বাগানে নামিয়া ব্যোমকেশ বাগানের একটা কোণ লক্ষ্য করিয়া চলিল। গাছপালা ঝোপঝাড়ে

বেশীদূর পর্যন্ত দেখা যায় না, কিন্তু ঘাসে ঢাকা সঙ্কীর্ণ পথগুলি মাকড়সার জালের মত চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম ব্যোমকেশ ফাল্গুনী পালের আস্তানার সন্ধানে চলিয়াছে।

বাগানের কোণে আসিয়া পৌঁছিলাম। একটা মাটির ঘর, মাথায় টালির ছাউনি ; সম্ভবত মালীদের যন্ত্রপাতি রাখিবার স্থান। পাশেই একটা প্রকাণ্ড ইঁদারা।

ঘরের দ্বার খোলা রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে অন্ধকার। আমি টর্চের আলো ভিতরে ফেলিলাম। অন্ধকারে খড়ের বিছানার উপর কেহ শুইয়াছিল, আলো পড়িতেই উঠিয়া বাহিরে আসিল। দেখিলাম ফাল্গুনী পাল।

আজ ফাল্গুনীর মন ভাল নয়, কণ্ঠস্বরে ঔদাসীন্য-ভরা অভিমান। আমাদের দেখিয়া বলিল, 'আপনারাও কি পুলিসের লোক, আমার ঘর খানাতল্লাস করতে এসেছেন ? আসুন—দেখুন, প্রাণ ভরে খানাতল্লাস করুন। কিছু পাবেন না। আমি গরীব বটে কিন্তু চোর নই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা খানাতল্লাস করতে আসি নি। আপনাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কাল রাত্রে আপনি উষানাথবাবুর বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন ?'

ফাল্গুনী তিক্তস্বরে বলিল, 'তাঁর একটা ছবি এঁকেছিলাম, তাই দেখাতে গিয়েছিলাম। দারোয়ান দেখা করতে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। বেশ কথা, ভাল কথা। কিন্তু সেজন্য পুলিস লেলিয়ে দেবার কি দরকার ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভারি অন্যায়। আমি পুলিসকে বলে দেব, তারা আপনাকে আর বিরক্ত করবে না।'

'ধন্যবাদ' বলিয়া ফাল্গুনী আবার কোটরে প্রবেশ করিল। আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

দিনের আলো প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। আমরা বাগানে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু রজনীকে দেখিতে পাইলাম না।

বাগানের অন্য প্রান্তে বড় বড় পাথরের চ্যাঙড় দিয়া একটা উচ্চ ক্রীড়াশৈল রচিত হইয়াছিল। তাহাকে ঘিরিয়া সবুজ শ্যাওলার বন্ধনী। ক্রীড়াশৈলটি আকারে চারকোণা, দেখিতে অনেকটা পিরামিডের মত।

আমরা তাহার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পিরামিডের অপর পার হইতে আবেগোদ্ধত কণ্ঠস্বর কানে আসিল, 'ছবি ছবি ছবি। কি হবে ছবি! চাই না ছবি!'

'আস্তে! কেউ শুনতে পাবে।'

কণ্ঠস্বর দুইটি পরিচিত; প্রথমটি ডাক্তার ঘটকের, দ্বিতীয়টি রজনীর। ডাক্তার ঘটককে আমরা শান্ত সংযতবাক্ মানুষ বলিয়াই জানি; তাহার কণ্ঠ হইতে যে এমন আর্ত উগ্রতা বাহির হইতে পারে তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। রজনীর কণ্ঠস্বরেও একটা শীৎকার আছে, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক নয়।

ডাক্তার ঘটক আবার যখন কথা কহিল তখন তাহার স্বর অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু আবেগের উন্মাদনা কিছুমাত্র কমে নাই। সে বলিল, 'আমি তোমাকে চাই—তোমাকে। দুধের বদলে জল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না।'

রজনী বলিল, 'আর আমি। আমি কি চাই না? কিন্তু উপায় যে নেই।'

ডাক্তার বলিল, 'উপায় আছে, তোমাকে বলছি।'

রজনী বলিল, 'কিন্তু বাবা—'

ডাক্তার বলিল, 'তুমি নাবালিকা নও। তোমার বাবা তোমাকে আটকাতে পারেন না।'

রজনী বলিল, 'তা জানি। কিন্তু—। শোন, লক্ষ্মীটি শোন, বাবার শরীর খারাপ যাচ্ছে, তিনি সেরে উঠুন—তার পর—'

ডাক্তার বলিল, 'না। আজই আমি জানতে চাই তুমি রাজী আছ কিনা।'

একটু নীরবতা। তারপর রজনী বলিল, 'আচ্ছা, আজই বলব, কিন্তু এখন নয়। আমাকে একটু সময় দাও। আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তুমি এস, আমি এখানে থাকবো; তখন কথা হবে। এখন হয়তো বাড়িতে কেউ এসেছে, আমাকে না দেখলে—

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল।

দু'জনে পা টিপিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, হঠাৎ চোখে পড়িল পিরামিডের অন্য পাশ হইতে আর একটা লোক আমাদেরই মত সন্তর্পণে দূরে চলিয়া

যাইতেছে। একবার মনে হইল বুঝি ডাক্তার ঘটক; কিন্তু ভাল করিয়া চিনিবার আগেই লোকটি অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পিরামিড হইতে অনেকখানি ঘুরিয়া দূরে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, বাড়ি ফেরা যাক। আজ আর দেখা করে কাজ নেই।'

রাস্তায় বাহির হইলাম। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, আকাশে চন্দ্র নাই, পথের পাশে কেরোসিনের আলোগুলি দূরে দূরে মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। আমি মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালিয়া পথ নির্ণয় করিতে করিতে চলিলাম।

ব্যোমকেশ চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছে। দুইটি বিদ্রোহোন্মুখ যুবক-যুবতীর নিয়তি কোন্ কুটিল পথে চলিয়াছে—বোধ করি তাহাই নির্ধারণের চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহার ধ্যানভঙ্গ করিলাম না।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'অন্ধ লোকটিকে চিনতে পারলে?'

বলিলাম, 'না। কে তিনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি হচ্ছেন আমাদের গৃহস্বামী অধ্যাপক আদিনাথ সোম।'

'তাই নাকি! ব্যোমকেশ, ব্যাপারটা আমার পক্ষে কিছু জটিল হয়ে উঠেছে। ছবি চুরি, পরী চুরি, নেশাখোর চিত্রকর, কানা হাকিম, অবৈধ প্রণয়, অধ্যাপকের আড়িপাতা—কিছু বুঝতে পারছি না।'

'না পারবারই কথা। রবীন্দ্রনাথের গান মনে আছে—'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে, জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে?'—আমিও সরু-মোটা তারের জট ছাড়াতে পারছি না।'

'আচ্ছা, এই যে ডাক্তার আর রজনীর ব্যাপার, এতে আমাদের কিছু করা উচিত নয় কি?'

ব্যোমকেশ দৃঢ়স্বরে বলিল, 'কিছু না। আমরা ক্রিকেট খেলার দর্শক, হাততালি দিতে পারি, দুয়ো দিতে পারি, কিন্তু খেলার মাঠে নেমে খেলায় বাগ্‌ড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে ঘোর বেয়াদপি।'

বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম সত্যবতী একাকিনী পশমের গেঞ্জি বুনিতেছে। বলিলাম, 'তোমার রুগীর খবর কি?'

সত্যবতী উত্তর দিল না, সেলাইয়ের উপর ঝুঁকিয়া দ্রুত কাঁটা চালাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি মুখে কথা নেই যে! মালতী দেবীকে দেখতে গিয়েছিলে তো?'

'গিয়েছিলাম'—সত্যবতী মুখ তুলিল না, কিন্তু তাহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ অদূরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল, হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সত্যবতী সূচীবিদ্ধবৎ চমকিয়া উঠিল, শয়নকক্ষের দ্বারের দিকে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিল, তারপর আবার সম্মুখে ঝুঁকিয়া দ্রুত কাঁটা চালাইতে লাগিল।

আমি তাহার পাশে বসিয়া বলিলাম, 'কি ব্যাপার খুলে বল দেখি।'

'কিছু না। চা খাবে তো? জল চড়াতে বলে এসেছি। দেখি—' বলিয়া সে উঠিবার উপক্রম করিল।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'আহা, কি হয়েছে আগে বল না! চা পরে হবে।'

সত্যবতী তখন আবেগভরে বলিয়া উঠিল, 'কি আবার হবে, ঐ লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষটার কাছে আমার যাওয়াই ভুল হয়েছিল। এমন পচা নোংরা মন—আমাকে বলে কিনা—কিন্তু সে আমি বলতে পারব না। যার অমন মন তার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়।'

শয়নকক্ষ হইতে আর এক ধমক হাসির আওয়াজ আসিল। সত্যবতী চলিয়া গেল। ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। রাগে আমার মুখও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধমনা স্ত্রীলোকের সন্দেহ পাত্রপাত্রী বিচার করে না জানি, কিন্তু সত্যবতীকে যে স্ত্রীলোক এরূপ পঙ্কিল দোষারোপ করিতে পারে, তাকে গুলি করিয়া মারা উচিত। ব্যোমকেশ হাসুক, আমার গা রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া ঘুম আসিল না; সারাদিনের নানা ঘটনায় মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঘড়িতে দেখিলাম দশটা; ডিসেম্বর মাসে রাত্রি দশটা এখানে গভীর রাত্রি। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী অনেকক্ষণ শুইয়া পড়িয়াছে।

বিছানায় শুইয়া ঘুম না আসিলে আমার সিগারেটের পিপাসা জাগিয়া ওঠে, সুতরাং শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। গায়ে আলোয়ান দিয়া সিগারেট ধরাইলাম। কিন্তু বদ্ধ ঘরে ধূমপান করিলে ঘরের বাতাস ধোঁয়ায় দূষিত হইয়া উঠিবে; আমি একটা জানালা ঈষৎ খুলিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম।

জানালাটা সদরের দিকে। সামনে ফটক, তাহার পরপারে রাস্তা, রাস্তার ধারে মিউনিসিপ্যালিটির আলোকস্তম্ভ না বলিয়া ধূমস্তম্ভ বলিলেই ভাল হয়। প্রদীপের তৈল শেষ হইয়া আসিতেছে।

মিনিট দুই তিন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছি, বাহিরে একটা অস্পষ্ট খস্ খস্ শব্দে চকিত হইয়া উঠিলাম। কে যেন বারান্দা হইতে নামিতেছে। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম একটি ছায়ামূর্তি ফটক পার হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আলোকস্তম্ভের পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে চিনিতে পারিলাম—কালো কোট-প্যাণ্ট-পরা অধ্যাপক সোম।

বিদ্যুৎ চমকের মত বুঝিতে পারিলাম এত রাত্রে তিনি কোথায় যাইতেছেন। আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মহীধরবাবুর বাগানে ডাক্তার ঘটক এবং রজনীর মিলিত হইবার কথা; সঙ্কেত-স্থলে সোম অনাহূত উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু কেন? কি তাঁহার অভিপ্রায়?

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে এই কথা ভাবিতেছি, সহসা অধিক বিস্ময়ের কারণ ঘটিল। আবার খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবার বাহির হইয়া আসিল মালতী দেবী। তাঁহাকে চিনিতে কষ্ট হইল না। একটা চাপা কাশির শব্দ; তারপর সোম যে পথে গিয়াছিলেন তিনিও সেই পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পরিস্থিতি স্পষ্টই বোঝা গেল। স্বামী অভিসারে যাইতেছেন, আর স্ত্রী অসুস্থ শরীর লইয়া এই শীতজর্জর রাত্রে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন। বোধ হয় স্বামীকে হাতে হাতে ধরিতে চান। উঃ, কি দুর্বহ ইহাদের জীবন! প্রেমহীন স্বামী এবং বিশ্বাসহীন পত্নীর দাম্পত্য জীবন কি ভয়ঙ্কর! এর চেয়ে ডাইভোর্স ভাল।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমার কিছু করা উচিত কিনা ভাবিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশকে জাগাইয়া সংবাদটা দিব? না, কাজ নাই, সে ঘুমাইতেছে ঘুমাক। বরং আমার ঘুম যেরূপ চটিয়া গিয়াছে, দু'ঘণ্টার মধ্যে আসিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং আমি জানালার কাছে বসিয়া পাহারা দিব। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

আবার সিগারেট ধরাইলাম।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট। দীপস্তম্ভের আলো ধোঁয়ায় দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গেল।

একটি মূর্তি ফটক দিয়া প্রবেশ করিল। নক্ষত্রের আলোয় মালতী দেবীর ভারী মোটা চেহারা চিনিতে পারিলাম। তিনি পদশব্দ গোপনের চেষ্টা করিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটা অবরুদ্ধ আওয়াজ বাহির হইল, তাহা চাপা কাশি কিংবা চাপা কান্না বুঝিতে পারিলাম না। তিনি উপরে চলিয়া গেলেন।

এত শীঘ্র শ্রীমতি ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু শ্রীমানের দেখা নাই। অনুমান করিলাম শ্রীমতী বেশী দূর স্বামীকে অনুসরণ করিতে পারেন নাই, অন্ধকারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তার পর এদিক ওদিক নিষ্ফল অন্বেষণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

সোম ফিরিলেন সাড়ে এগারটার সময়। বাদুড়ের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে বাড়ীর মধ্যে মিলাইয়া গেলেন।

৭

সকালে ব্যোমকেশকে রাত্রির ঘটনা বলিলাম। সে চুপ করিয়া শুনিল, কোনোও মন্তব্য করিল না।

একজন কনেষ্টবল একটা চিঠি দিয়া গেল। ডি-এস-পি পাণ্ডের চিঠি, আগের দিন সন্ধ্যা ছ'টার তারিখ। চিঠিতে মাত্র কয়েক ছত্র লেখা ছিল—

প্রিয় ব্যোমকেশবাবু,

ডেপুটি সাহেবের আলমারি খুলিয়া দেখা গেল কিছু চুরি যায় নাই। আপনি বলিয়াছিলেন পরীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, কিন্তু পরী এখনও

নিরুদ্দেশ। চোরেরও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন তাই লিখিলাম। ইতি—

পুরন্দর পাণ্ডে

ব্যোমকেশ চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া বলিল, 'পাণ্ডে লোকটি সত্যিকার সজ্জন।'

এই সময় যিনি সবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার। মহীধরবাবুর পার্টির পর রাস্তায় নকুলেশবাবুর সহিত দু'একবার দেখা হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম খবরটা দিয়ে যাই। শোনেননি নিশ্চয়ই? ফাল্গুনী পাল—সেই যে ছবি আঁকত—সে মহীধরবাবুর বাগানে কুয়োয় ডুবে মরেছে।'

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তারপর ব্যোমকেশ বলিল, 'কখন এ ব্যাপার হল?'

নকুলেশ বলিলেন, 'বোধ হয় কাল রাত্তিরে, ঠিক জানি না। মাতাল দাঁতাল লোক, অন্ধকারে তাল সামলাতে পারে নি, পড়েছে কুয়োয়। আজ সকালে আমি মহীধরবাবুর খবর নিতে গিয়েছিলাম, দেখি মালীরা কুয়ো থেকে লাস তুলছে।'

আমরা নীরবে পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। কাল রাত্রে মহীধরবাবুর বাগানে বহু বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে।

'আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি; আমাকে আবার ক্যামেরা নিয়ে ফিরে যেতে হবে—' বলিয়া নকুলেশ বাবু উঠিবার উপক্রম করিলেন।

'বসুন বসুন, চা খেয়ে যান।'

নকুলেশ চায়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, বসিলেন। অচিরাৎ চা আসিয়া পড়িল। দু'চার কথার পর ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সেই গ্রুপ-ফটোর নেগেটিভখানা খুঁজেছিলেন কি?'

'কোন্ নেগেটিভ? ও—হ্যাঁ, অনেক খুঁজেছি মশাই, পাওয়া গেল না। —আমার লোকসানের বরাত; থাকলে আরও পাঁচখানা বিক্রী হত।'

'আচ্ছা, সেই ফটোতে কে কে ছিল বলুন দেখি?'

'কে কে ছিল? পিক্‌নিকে গিয়েছিলাম ধরুন—আমি, মহীধরবাবু,

তাঁর মেয়ে রজনী, ডাক্তার ঘটক, সস্ত্রীক প্রোফেসর সোম, সপরিবারে ডেপুটি উষানাথবাবু আর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। সকলেই ফটোতে ছিলেন। ফটোখানা ভারি উৎরে গিয়েছিল—গ্রুপ-ফটো অত ভাল খুব একটা হয় না। আচ্ছা, চলি তা হলে। আর একদিন আসব।'

নকুলেশবাবু প্রস্থান করিলেন। দু'জন কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। ফাল্গুনীর কথা ভাবিয়া মনটা ভারী হইয়া উঠিল। সে নেশাখোর লক্ষ্মীছাড়া ছিল, কিন্তু ভগবান তাহাকে প্রতিভা দিয়াছিলেন। এমনভাবে অপঘাত মৃত্যুই যদি তাহার নিয়তি, তবে তাহাকে প্রতিভা দিবার কি প্রয়োজন ছিল?

ব্যোমকেশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল; 'এ সম্ভাবনা আমার মনেই আসে নি। চল, বেরুনো যাক।'

'কোথায় যাবে?'

'ব্যাঙ্কে যাব। কিছু টাকা বের করতে হবে।'

এখানে আসিয়া স্থানীয় ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা রাখা হইয়াছিল, সংসার-খরচের প্রয়োজন অনুসারে বাহির করা হইত।

আমরা সদর বারান্দায় বাহির হইয়াছি, দেখিলাম অধ্যাপক সোম ড্রেসিং-গাউন পরিহিত অবস্থায় নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মুখে উদ্বিগ্ন গাম্ভীর্য! ব্যোমকেশ সম্ভাষণ করিল, 'কি খবর?'

সোম বলিলেন, 'খবর ভাল নয়। স্ত্রীর অসুখ খুব বেড়েছে। বোধ হয় নিউমোনিয়া। জ্বর বেড়েছে; মাঝে মাঝে ভুল বকছেন মনে হল।'

আশ্চর্য নয়। কাল রাত্রে সর্দির উপর ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। কিন্তু সোম বোধ হয় তাহা জানেন না। ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে খবর দিয়েছেন?'

ডাক্তার ঘটকের নামে সোমের মুখ অন্ধকার হইল। তিনি বলিলেন, 'ঘটককে ডাকব না। আমি অন্য ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ চক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কেন? ডাক্তার ঘটকের ওপর কি আপনার বিশ্বাস নেই? আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন কিন্তু আপনি ঘটককেই সুপারিশ করেছিলেন।'

সোম ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন। ব্যোমকেশ তখন বলিল,

নিরুদ্দেশ। চোরেরও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন তাই লিখিলাম। ইতি—

পুরন্দর পাণ্ডে

ব্যোমকেশ চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া বলিল, 'পাণ্ডে লোকটি সত্যিকার সজ্জন।'

এই সময় যিনি সবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার। মহীধরবাবুর পার্টির পর রাস্তায় নকুলেশবাবুর সহিত দু'একবার দেখা হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম খবরটা দিয়ে যাই। শোনেননি নিশ্চয়ই? ফাল্গুনী পাল—সেই যে ছবি আঁকত—সে মহীধরবাবুর বাগানে কুয়োয় ডুবে মরেছে।'

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তারপর ব্যোমকেশ বলিল, 'কখন এ ব্যাপার হল?'

নকুলেশ বলিলেন, 'বোধ হয় কাল রাত্তিরে, ঠিক জানি না। মাতাল দাঁতাল লোক, অন্ধকারে তাল সামলাতে পারে নি, পড়েছে কুয়োয়। আজ সকালে আমি মহীধরবাবুর খবর নিতে গিয়েছিলাম, দেখি মালীরা কুয়ো থেকে লাস তুলছে।'

আমরা নীরবে পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। কাল রাত্রে মহীধরবাবুর বাগানে বহু বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে।

'আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি; আমাকে আবার ক্যামেরা নিয়ে ফিরে যেতে হবে—' বলিয়া নকুলেশ বাবু উঠিবার উপক্রম করিলেন।

'বসুন বসুন, চা খেয়ে যান।'

নকুলেশ চায়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, বসিলেন। অচিরাৎ চা আসিয়া পড়িল। দু'চার কথার পর ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সেই গ্রুপ-ফটোর নেগেটিভখানা খুঁজেছিলেন কি?'

'কোন্ নেগেটিভ? ও—হ্যাঁ, অনেক খুঁজেছি মশাই, পাওয়া গেল না। —আমার লোকসানের বরাত; থাকলে আরও পাঁচখানা বিক্রী হত।'

'আচ্ছা, সেই ফটোতে কে কে ছিল বলুন দেখি?'

'কে কে ছিল? পিক্‌নিকে গিয়েছিলাম ধরুন—আমি, মহীধরবাবু,

তাঁর মেয়ে রজনী, ডাক্তার ঘটক, সস্ত্রীক প্রোফেসর সোম, সপরিবারে ডেপুটি উষানাথবাবু আর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। সকলেই ফটোতে ছিলেন। ফটোখানা ভারি উৎরে গিয়েছিল—গ্রুপ-ফটো অত ভাল খুব একটা হয় না। আচ্ছা, চলি তা হলে। আর একদিন আসব।'

নকুলেশবাবু প্রস্থান করিলেন। দু'জন কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। ফাল্গুনীর কথা ভাবিয়া মনটা ভারী হইয়া উঠিল। সে নেশাখোর লক্ষ্মীছাড়া ছিল, কিন্তু ভগবান তাহাকে প্রতিভা দিয়াছিলেন। এমনভাবে অপঘাত মৃত্যুই যদি তাহার নিয়তি, তবে তাহাকে প্রতিভা দিবার কি প্রয়োজন ছিল?

ব্যোমকেশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল; 'এ সম্ভাবনা আমার মনেই আসে নি। চল, বেরুনো যাক।'

'কোথায় যাবে?'

'ব্যাঙ্কে যাব। কিছু টাকা বের করতে হবে।'

এখানে আসিয়া স্থানীয় ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা রাখা হইয়াছিল, সংসার-খরচের প্রয়োজন অনুসারে বাহির করা হইত।

আমরা সদর বারান্দায় বাহির হইয়াছি, দেখিলাম অধ্যাপক সোম ড্রেসিং-গাউন পরিহিত অবস্থায় নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মুখে উদ্বিগ্ন গাম্ভীর্য। ব্যোমকেশ সম্ভাষণ করিল, 'কি খবর?'

সোম বলিলেন, 'খবর ভাল নয়। স্ত্রীর অসুখ খুব বেড়েছে। বোধ হয় নিউমোনিয়া। জ্বর বেড়েছে; মাঝে মাঝে ভুল বকছেন মনে হল।'

আশ্চর্য নয়। কাল রাত্রে সর্দির উপর ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। কিন্তু সোম বোধ হয় তাহা জানেন না। ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে খবর দিয়েছেন?'

ডাক্তার ঘটকের নামে সোমের মুখ অন্ধকার হইল। তিনি বলিলেন, 'ঘটককে ডাকব না। আমি অন্য ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ চক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কেন? ডাক্তার ঘটকের ওপর কি আপনার বিশ্বাস নেই? আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন কিন্তু আপনি ঘটককেই সুপারিশ করেছিলেন।'

সোম ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন। ব্যোমকেশ তখন বলিল,

'সে যাক! এই মাত্র খবর পেলাম ফাল্গুনী পাল কাল রাত্রে মহীধরবাবুর কুয়োয় ডুবে মারা গেছে।'

সোম বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, 'তাই নাকি! হয়তো আত্মহত্যা করেছে। আর্টিস্টরা একটু অব্যবস্থিতচিত্ত হয়—'

ব্যোমকেশ বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করিল, 'প্রোফেসর সোম, কাল রাত্রি এগারোটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

সোম চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ পাংশু হইয়া গেল। তিনি স্খলিত-স্বরে বলিলেন, 'আমি—আমি! কে বললে আমি কোথাও গিয়েছিলাম? আমি তো—'

হাত তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মিছে কথা বলে লাভ নেই। প্রোফেসর সোম, আপনার স্ত্রীর যে আজ এত বাড়াবাড়ি হয়েছে তার জন্যে আপনি দায়ী। তিনি কাল আপনার পেছনে পেছনে রাস্তায় বেরিয়ে ছিলেন। এই রোগে যদি তাঁর মৃত্যু হয়—'

ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া সোম বলিলেন, 'আমার স্ত্রী—ব্যোমকেশ বাবু, বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না—'

ব্যোমকেশ তর্জনী তুলিয়া ভয়ঙ্কর গম্ভীর স্বরে বলিল, 'কিন্তু আমরা জানি। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনি সাবধানে থাকবেন। এস অজিত।'

সোম স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় কিছু দূর গিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সোমকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছি।' তার পর ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'ব্যাঙ্ক খুলতে এখনও দেরি আছে। চল, ডাক্তার ঘটকের ডিস্‌পেন্‌সারিতে একবার ঢুঁ মেরে যাই।'

বাজারের দিকে ডাক্তারের ঔষধালয়। সবে খুলিয়াছে। আমরা ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করিতে যাইব, শুনিলাম সে একজনকে বলিতেছে, 'দেখুন, আপনার ছেলের টাইফয়েড হয়েছে; লম্বা কেস্, সারাতে সময় লাগবে। আমি এখন লম্বা কেস্ হাত নিতে পারব না। আপনি বরং শ্রীধরবাবুর কাছে যান—তিনি প্রবীণ ডাক্তার—'

আমরা প্রবেশ করিলাম, অন্য লোকটি চলিয়া গেল। ডাক্তার সানন্দে

আমাদের অভ্যর্থনা করিল। বলিল, 'আসুন আসুন। রোগী যখন সশরীরে ডাক্তারের বাড়িতে আসে তখন বুঝতে হবে রোগ সেরেছে। মহীধরবাবু সেদিন আমাকে ঘোড়ার ডাক্তার বলেছিলেন। এখন আপনিই বলুন, আমি মানুষের ডাক্তার কিংবা আপনি ঘোড়া!'—বলিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিল। ডাক্তারের মন আজ ভারি প্রফুল্ল; চোখে আনন্দের জ্যোতি।

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'আপনি মানুষের ডাক্তার এই কথা স্বীকার করে নেওয়াই আমার পক্ষে সম্মানজনক। মহীধরবাবু কেমন আছেন?

ডাক্তার বলিল, 'অনেকটা ভাল। প্রায় সেরে উঠেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ফাল্গুনী পাল মারা গেছে শুনেছেন কি?'

ডাক্তার চকিত হইয়া বলিল, 'সেই চিত্রকর! কি হয়েছিল তার?'

'কিছু হয়নি। কাল রাত্রে জলে ডুবে মারা গেছে'—ব্যোমকেশ যতটুকু জানিত সংক্ষেপে বলিল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আমার যাওয়া উচিত। মহীধরবাবুর দুর্বল শরীর—। যাই, একবার চট্ করে ঘুরে আসি।' ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ সহসা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কলকাতা যাচ্ছেন কবে?'

ডাক্তারের মুখের ভাব সহসা পরিবর্তিত হইল; সে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ব্যোমকেশের চোখের মধ্যে চাহিয়া বলিল, 'আমি কলকাতা যাচ্ছি কে বললে আপনাকে?'

ব্যোমকেশ কেবল মৃদু হাসিল। ডাক্তার তখন বলিল, 'হ্যাঁ, শিগ্‌গীরই একবার যাবার ইচ্ছে আছে। আচ্ছা চললাম। যদি সময় পাই ওবেলা আপনাদের বাড়িতে যাব।'

ডাক্তার ক্ষুদ্র মোটরে চড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা ব্যাঙ্কের দিকে চলিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ডাক্তার কলকাতা যাচ্ছে জানলে কি করে? তুমি কি আজকাল অন্তর্যামী হয়েছ নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। কিন্তু একজন ডাক্তার যখন বলে লম্বা কেস্ হাতে নেব না, অন্য ডাক্তারের কাছে যাও, তখন আন্দাজ করা যেতে পারে যে সে বাইরে যাবে।'

'কিন্তু কলকাতায়ই যাবে তার নিশ্চয়তা কি?'

'ওটা ডাক্তারের প্রফুল্লতা থেকে অনুমান করলাম।'

৮

ডাক্তারের ঔষধালয় হইতে অনতিদূরে ব্যাঙ্ক। আমরা গিয়া দেখিলাম ব্যাঙ্কের দ্বার খুলিয়াছে। দ্বারের দুই পাশে বন্দুক-কিরিচধারী দুইজন সান্ত্রী পাহারা দিতেছে।

বড় একটি ঘর দুই ভাগে বিভক্ত, মাঝে কাঠ ও কাঁচের অনুচ্চ বেড়া। বেড়ার গায়ে সারি সারি জানালা। এই জানালা দিয়া জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের লেন-দেন হইয়া থাকে।

ব্যোমকেশ একটি জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া চেক্ লিখিতেছে, দেখিলাম বেড়ার ভিতর দিকে ম্যানেজার অমরেশ রাহা দাঁড়াইয়া একজন কেরানীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। অমরেশবাবুও আমাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি স্মিতমুখে বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, 'নমস্কার। ভাগ্যে আপনাদের দেখে ফেললাম নইলে ত টাকা নিয়েই চলে যেতেন!

অমরেশবাবুকে চায়ের পার্টির পর আর দেখি নাই। তিনি সেজন্য লজ্জিত; ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'রোজই মনে করি আপনাদের বাড়িতে যাব, কিন্তু একটা না একটা কাজ পড়ে যায়। ব্যাঙ্কের চাকরি মানে অষ্টপ্রহরের গোলামি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এমন গোলামীতে সুখ আছে। হরদম টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।'

অমরেশবাবু করুণ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'সুখ আর কৈ ব্যোমকেশ-বাবু। চিনির বলদ চিনির বোঝা বয়ে মরে, কিন্তু দিনের শেষে খায় সেই ঘাস জল।'

ব্যোমকেশ চেকের বদলে টাকা পকেটস্থ করিলে অমরেশ বাবু বলিলেন, 'চলুন, আজ যখন পেয়েছি আপনাকে সহজে ছাড়ব না। আমার আপিস-ঘরে বসে খানিক গল্প-সল্প করা যাক। আপনার প্রতিভার যে পরিচয়

অজিতবাবুর লেখা থেকে পাওয়া যায়, তাতে আপনাকে পেলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আমাদের দেশে প্রতিভাবান মানুষের বড়ই অভাব।'

ভদ্রলোক শুধু যে ব্যোমকেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাহাই নয়, সাহিত্য-রসিকও বটে। সেদিন তাঁহার সহিত অধিক আলাপ করি নাই বলিয়া অনুতপ্ত হইলাম।

তিনি আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার একটি নিজস্ব আপিস-ঘর আছে, তাহার দ্বার পর্যন্ত গিয়া তিনি বলিলেন, 'না, এখানে নয়। চলুন, ওপরে যাই। এখানে গণ্ডগোল, কাজের হুড়োহুড়ি। ওপরে বেশ নিরিবিলি হবে।'

আপিস-ঘরের দরজা খোলা ছিল; ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, মামুলী টেবিল চেয়ার খাতাপত্র, কয়েকটা বড় বড় লোহার সিন্দুক ছাড়া আর কিছু নাই।

কাছেই সিঁড়ি। উপরে উঠিতে উঠিতে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওপরতলাটা বুঝি আপনার কোয়ার্টার?'

'হ্যাঁ। ব্যাঙ্কেরও সুবিধে।'

'স্ত্রী-পুত্র পরিবার সব এখানেই থাকেন?'

'স্ত্রী-পুত্র পরিবার আমার নেই ব্যোমকেশবাবু। ভগবান সুমতি দিয়েছিলেন, বিয়ে করিনি। একলা মানুষ, তাই ভদ্রভাবে চলে যায়। বিয়ে করলে হাড়ির হাল হত।'

উপরতলাটি একজন লোকের পক্ষে বেশ সুপরিসর। তিন চারটি ঘর, সামনে উন্মুক্ত ছাদ। অমরেশবাবু আমাদের বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন ঘর; দেওয়ালে ছবি নাই, মেঝেয় গালিচা নাই। এক পাশে একটি জাজিম-ঢাকা চৌকি, দুই-তিনটি আরাম কেদারা, একটি বইয়ের আলমারি। নিতান্তই মামুলী ব্যাপার, কিন্তু বেশ তৃপ্তিদায়ক। গৃহস্বামী যে গোছালো স্বভাবের লোক তাহা বোঝা যায়।

'বসুন, চা তৈরি করতে বলি।' বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

বইয়ের আলমারিটা আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, উঠিয়া গিয়া বইগুলি দেখিলাম। অধিকাংশ বই গল্প উপন্যাস, চলন্তিকা আছে, সঞ্চয়িতা আছে।

আমার রচিত ব্যোমকেশের উপন্যাসগুলিও আছে দেখিয়া পুলকিত হইলাম।

ব্যোমকেশও আসিয়া জুটিল। সে একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা খুলিল; দেখিলাম বইখানা বাংলা ভাষায় নয়, ভারতবর্ষেরই অন্য কোনোও প্রদেশের লিপি। অনেকটা হিন্দীর মতন, কিন্তু ঠিক হিন্দী নয়।

এই সময় অমরেশবাবু ফিরিয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি গুজরাটী ভাষাও জানেন?'

অমরেশবাবু মুখে চট্‌কার শব্দ করিয়া বলিলেন, 'জানি আর কৈ? একসময় শেখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ও আমার দ্বারা হল না। বাঙালীর ছেলে মাতৃভাষা শিখতেই গলদ্‌ঘর্ম হয়, তার ওপর ইংরিজি আছে। উপরন্তু যদি একটা তৃতীয় ভাষা শিখতে হয় তাহলে আর বাঙালীর শক্তিতে কুলোয় না। অথচ শিখতে পারলে আমার উপকার হত। ব্যাঙ্কের কাজে গুজরাটী ভাষা জানা থাকলে অনেক সুবিধা হয়।'

আমরা আবার আসিয়া বসিলাম। দুই-চারিটি একথা সেকথার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'ফাল্গুনী পাল মারা গেছে শুনেছেন বোধ হয়?'

অমরেশবাবু চেয়ার হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন? 'অ্যাঁ। ফাল্গুনী পাল মারা গেছে! সে কি! কবে—কোথায়—কি করে মারা গেল?'

ব্যোমকেশ ফাল্গুনীর মৃত্যু-বিবরণ বলিল। শুনিয়া অমরেশবাবু দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা বেচারা! বড় দুঃখে পড়েছিল। কাল আমার কাছে এসেছিল।'

এবার আমাদের বিস্মিত হইবার পালা। ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'কাল এসেছিল? কখন?'

অমরেশবাবু বলিলেন, 'সকালবেলা। কাল রবিবার ছিল, ব্যাঙ্ক বন্ধ; সবে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে বসেছি, ফাল্গুনী এসে হাজির, আমার ছবি এঁকেছে তাই দেখাতে এসেছিল—'

'ও—'

চাকর তিন পেয়ালা চা দিয়া গেল। তক্‌মা-আঁটা চাকর, বুঝিলাম

ব্যাঙ্কের পিওন; অবসরকালে বাড়ির কাজও করে। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল অমরেশবাবু টাকা-পয়সার ব্যাপারে বিলক্ষণ হিসাবী।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় চামচ ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, 'ছবিখানা কিনলেন নাকি?'

অমরেশবাবু বিমর্ষ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'কিনতে হল। পাঁচ টাকা দিতে গেলাম কিছুতেই নিলে না, দশ টাকা আদায় করে ছাড়ল। এমন জানলে—

ব্যোমকেশ চায়ে একটা চুমুক দিয়া বলিল, 'মৃত চিত্রকরের শেষ ছবি। দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।'

'দেখুন না। ভালই এঁকেছে বোধ হয়। আমি অবশ্য ছবির কিছু বুঝি না—'

বইয়ের আলমারির নীচের দেরাজ হইতে একখণ্ড পুরু চতুষ্কোণ কাগজ আনিয়া তিনি আমাদের সম্মুখে ধরিলেন।

ফাল্গুনী ভাল ছবি আঁকিয়াছে; অমরেশবাবুর বিশেষত্বহীন চেহারাও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যোমকেশ চিত্রবিদ্যার একজন জহুরী, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ছবিটা দেখিতে লাগিল।

অমরেশবাবু আগে বেশ প্রফুল্লমুখে কথাবার্তা বলিতেছিলেন, কিন্তু ফাল্গুনীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিবার পর কেমন যেন মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন। প্রায় নীরবেই চা-পান শেষ হইল। পেয়ালা রাখিয়া অমরেশবাবু স্তিমিত স্বরে বলিলেন, 'ফাল্গুনীর কথায় মনে পড়ল, সেদিন চায়ের পার্টিতে শুনেছিলাম পিক্‌নিকের ফটোখানা চুরি গেছে। মনে আছে? তার কোনোও হদিস পাওয়া গেল কিনা কে জানে।'

ব্যোমকেশ মগ্ন হইয়া ছবি দেখিতেছিল, উত্তর দিল না। আমিও কিছু বলা উচিত কিনা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত অমরেশবাবুর পানে চাহিয়া রহিলাম। অমরেশবাবু তখন নিজেই বলিলেন, 'সামান্য ব্যাপার, তাই ও নিয়ে বোধ হয় কেউ মাথা ঘামায়নি।'

ব্যোমকেশ ছবি নামাইয়া রাখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, 'চমৎকার ছবি। লোকটা যদি বেঁচে থাকত, আমিও ওকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিতাম।

অমরেশবাবু, ছবিখানা যত্ন করে রাখবেন। আজ ফাল্গুনী পালের নাম কেউ জানে না, কিন্তু একদিন আসবে যেদিন ওর আঁকা ছবি সোনার দরে বিক্রী হবে।'

অমরেশবাবু একটু প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি! তাহলে দশটা টাকা জলে পড়েনি? ছবিটা বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙানো চলবে?'

'নিশ্চয়।'

অতঃপর আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। অমরেশবাবু বলিলেন, 'আবার দেখা হবে। বছর শেষ হতে চলল, আমাকে আবার নববর্ষের ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে হেড আপিসের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। এবার নববর্ষে দু'দিন ছুটি!'

'দু'দিন ছুটি কেন?'

'এবার একত্রিশে ডিসেম্বর রবিবার পড়েছে। শনিবার যদি অর্ধেক দিন ধরেন, তাহলে আড়াই দিন ছুটি পাওয়া যাবে। আপনারা এখনও কিছুদিন আছেন তো?'

'২রা জানুয়ারী পর্যন্ত আছি বোধ হয়।'

'আচ্ছা, নমস্কার।'

আমরা বাহির হইলাম। ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া নামিতে হইল না, বাড়ির পিছনদিকে একটা খিড়কি-সিঁড়ি ছিল, সেই পথে নামিয়া রাস্তায় আসিলাম। বাজারের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সিগারেট ফুরাইয়াছে। বলিলাম, 'এস, এক টিন সিগারেট কিনতে হবে।'

ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক ছিল, চমকিয়া উঠিল। বলিল, 'আরে তাই তো! আমাকেও একটা জিনিস কিনতে হবে।'

একটা বড় মণিহারীর দোকানে ঢুকিলাম। আমি এক দিকে সিগারেট কিনিতে গেলাম, ব্যোমকেশ অন্য দিকে গেল। আমি সিগারেট কিনিতে কিনিতে আড়চোখে দেখিলাম বোমকেশ একটা দামী এসেন্সের শিশি কিনিয়া পকেটে পুরিল।

মনে মনে হাসিলাম। ইহারা কেন যে ঝগড়া করে, কেনই বা ভাব করে কিছু বুঝি না। দাম্পত্য-জীবন আমার কাছে একটা হাস্যকর প্রহেলিকা।

সেদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিবার জন্য বিছানায় লম্বা হইয়াছিলাম, ঘুম ভাঙিয়া দেখি বেলা সাড়ে তিনটা।

ব্যোমকেশের ঘর হইতে মৃদু জল্পনার শব্দ আসিতেছিল ; উঁকি মারিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ চেয়ারে বসিয়াছে এবং সত্যবতী তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে কি সব বলিতেছে। দু'জনের মুখেই হাসি।

সরিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, 'ওহে কপোত-কপোতী, তোমাদের কূজন-গুঞ্জন শেষ হতে যদি দেরি থাকে তাহলে না হয় আমিই চায়ের ব্যবস্থা করি।'

সত্যবতী সলজ্জভাবে মুখের খানিকটা আঁচলের আড়াল দিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। খানিক পরে ব্যোমকেশ জলন্ত সিগারেট হইতে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বাহির হইল। অবাক হইয়া বলিলাম, 'ব্যাপার কি! ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়ছ যে।'

ব্যোমকেশ একগাল হাসিয়া বলিল, 'পার্‌মিশান পেয়ে গেছি। আজ থেকে যত ইচ্ছে!'

বুঝিলাম দাম্পত্য-জীবনে কেবল প্রেম থাকলেই চলে না, কূটবুদ্ধিরও প্রয়োজন।

৯

চা পান করিয়া উপরতলায় রোগিণীর সংবাদ লইতে গেলাম। সামাজিক কর্তব্য পালন না করিলে নয়।

অধ্যাপক সোমের মুখ চিন্তাক্রান্ত। মালতী দেবীর অবস্থা খুবই খারাপ, তবে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার মত নয়। দুটা ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে, অক্সিজেন দেওয়া হইতেছে। জ্বর খুব বেশী, রোগিণী মাঝে মাঝে ভুল বকিতেছেন। একজন নার্সকে সেবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে।

স্বখাত সলিল। সহানুভূতি জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

নীচে নামিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার ঘটক আসিল।

এবেলা ডাক্তারের ভাবভঙ্গী অন্য প্রকার। একটু সতর্ক, একটু সন্দিগ্ধ, একটু অন্তঃপ্রবিষ্ট। ব্যোমকেশের পানে মাঝে মাঝে এমন ভাবে তাকাইতেছে যেন ব্যোমকেশ সম্বন্ধে তাহার মনে কোনোও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

কথাবার্তা সাধারণ ভাবেই হইল। ডাক্তার সকালে মহীধরবাবুর বাড়িতে গিয়া ফাল্গুনীর লাস দেখিয়াছিল, সেই কথা বলিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দেখলেন? মৃত্যুর কারণ জানা গেল?'

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'অটপ্সি না হওয়া পর্যন্ত জোর করে কিছু বলা যায় না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তবু আপনি ডাক্তার, আপনি কি কিছুই বুঝতে পারলেন না?'

ইতস্তত করিয়া ডাক্তার বলিল, 'না।'

ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'ও কথা যাক। মহীধরবাবু কেমন আছেন? কাল বিকেলে আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম; কিন্তু ডাকাডাকি করেও কারুর সাড়া পাওয়া গেল না, তাই ফিরে এলাম।'

ডাক্তার সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করিল, 'ক'টার সময় গিয়েছিলেন?'

'আন্দাজ পাঁচটার সময়।'

ডাক্তার একটু ভাবিয়া বলিল, 'কি জানি। আমিও বিকেলবেলা গিয়েছিলাম, কিন্তু পাঁচটার আগে ফিরে এসেছিলাম। মহীধরবাবু ভালই আছেন। তবে আজকে বাড়িতে এই ব্যাপার হল—একটু শক্ পেয়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আর রজনী দেবী! তিনি কেমন আছেন?'

ডাক্তারের মুখের উপর দিয়া একটা রক্তাভা খেলিয়া গেল। কিন্তু সে ধীরে ধীরে বলিল, 'রজনী দেবী ভালই আছেন। তাঁর অসুখ করেছে এমন কথা ত শুনিনি। আচ্ছা, আজ উঠি।'

ডাক্তার উঠিল। আমরাও উঠিলাম। দ্বার পর্যন্ত আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কলকাতা যাওয়া তাহলে স্থির?'

ডাক্তার ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দুটো সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি এখানে শরীর

সারাতে এসেছেন, গোয়েন্দাগিরি করতে নয়। যা আপনার এলাকার বাইরে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।' বলিয়া গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'ডাক্তার ঘটক এমনিতে খুব ভাল-মানুষ, কিন্তু ল্যাজে পা পড়লে একেবারে কেউটে সাপ।'

বাহিরে মোটর বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ আসিয়া থামিল। ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'আরে পাণ্ডে সাহেব এসেছেন। ভালই হল।'

পাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। ক্লান্ত হাসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশ বাবু, আপনার কথা ফলে গেল। পরী উদ্ধার করেছি।

ব্যোমকেশ তাঁহাকে চেয়ার দিয়া বলিল, 'বসুন। কোথা থেকে পরী উদ্ধার করলেন?'

'মহীধরবাবুর কুয়ো থেকে। ফাল্গুনীর লাস বেরুবার পর কুয়োয় ডুবুরি নামিয়েছিলাম। উষানাথবাবুর পরী বেরিয়েছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আর কিছু?'

'আর কিছু না।'

'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। ফাল্গুনী জলে ডুবে মরে নি, মৃত্যুর পর তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।'

'হুঁ। অর্থাৎ কাল রাত্রে তাকে কেউ খুন করেছে। তার পর মৃতদেহটা কুয়োয় ফেলে দিয়েছে। আত্মহত্যা নয়।

'তাই ত মনে হচ্ছে। কিন্তু ফাল্গুনীর মতন একটা অপদার্থ লোককে খুন করে কার কি লাভ?'

'লাভ নিশ্চয় আছে, নইলে খুন করবে কেন? অপদার্থ লোক যদি কোনও সাংঘাতিক গুপ্তকথা জানতে পারে তাহলে তার বেঁচে থাকা কারুর কারুর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ফাল্গুনী অপদার্থ ছিল বটে, কিন্তু নির্বোধ ছিল না।'

পাণ্ডে বিরস মুখে বলিলেন, 'তা বটে। কিন্তু আমি ভাবছি, পরীটা

কুয়োর মধ্যে এল কি করে? তবে কি ফাল্গুনীই পরী চুরি করেছিল? খুনীর সঙ্গে ফাল্গুনীর কি পরী নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি হয়েছিল? তারপর খুনী ফাল্গুনীকে ঠেলে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে?—কিন্তু পরীটা তো এমন কিছু দামী জিনিস নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাল কথা, ফাল্গুনীর গায়ে কি কোনোও আঘাত-চিহ্ন পাওয়া গেছে।'

'না। কিন্তু তার পেটে অনেকখানি আফিম পাওয়া গেছে। মদের সঙ্গে আফিম মেশান ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। দেখুন কি করে ফাল্গুনীর মৃত্যু হল সেটা বড় কথা নয়, কেন মৃত্যু হল সেইটেই আসল কথা।'

পাণ্ডে উৎসুক চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'এ বিষয়ে আপনি কি কিছু বুঝেছেন ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'বোধ হয় কিছু কিছু বুঝেছি। আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আপনার শোনবার সময় হবে কি?'

পাণ্ডে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বলিলেন, 'সময় হবে কিনা দেখাচ্ছি। চলুন আমার বাড়িতে, একেবারে রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরবেন।'

পাণ্ডে ব্যোমকেশকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

আমি আর সত্যবতী রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত তাস লইয়া গোলামচোর খেলিলাম।

ব্যোমকেশ ফিরিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হল এতক্ষণ ধরে?'

ব্যোমকেশ স্বর্গীয় হাস্য করিয় বলিল, 'আঃ, মুর্গিটা যা রেঁধেছিল!'

ধমক দিয়া বলিলাম, 'কথা চাপা দিও না। পাঁচ ঘণ্টা ধরে কি কথা হল?'

ব্যোমকেশ জিভ কাটিল, 'পুলিশের গুপ্তকথা কি বলতে আছে? তবে এমন কোনোও কথা হয়নি যা তুমি জান না।'

'হত্যাকারী কে?'

'পাঁচকড়ি দে।' বলিয়া ব্যোমকেশ সুট্ করিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পড়িল।

বড়দিন আসিয়া চলিয়া গিয়াছে; নববর্ষ সমাগতপ্রায়। এখানে বড়দিন ও নববর্ষের উৎসবে বিশেষ হৈ চৈ হয় না, সাহেব-মেমরা হুইস্কি খাইয়া একটু নাচানাচি করে এই পর্যন্ত।

এ কয়দিনে নূতন কোনোও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। মালতী দেবীর রোগ ভালর দিকেই আসিতেছিল; কিন্তু তিনি একটু সংবিৎ পাইয়া দেখিলেন ঘরে যুবতী নার্স রহিয়াছে। অমনি তাঁহার ষষ্ঠ রিপু প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি গালাগালি দিয়া নার্সকে তাড়াইয়া দিলেন। ফলে অবস্থা আবার যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে, অধ্যাপক সোম একা হিম্‌সিম্ খাইতেছেন।

শনিবার ৩০শে ডিসেম্বর সকালবেলা ব্যোমকেশ বলিল, 'চল আজ একটু রোঁদে বেরুনো যাক।'

রিক্‌শা চড়িয়া বাহির হইলাম।

প্রথমে উপস্থিত হইলাম নকুলেশবাবুর ফটোগ্রাফির দোকানে। নীচে দোকান, উপর তলায় নকুলেশবাবুর বাসস্থান। তিনি উপরে ছিলেন, আমাদের দেখিয়া যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল তিনি বাঁধাছাঁদা করিতেছিলেন; কাষ্ঠ হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন—ছবি তোলাবেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন নয়। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আপনার দোকানটা দেখে যাই।'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'বেশ বেশ। আমি কিন্তু ভাল ছবি তুলি। এখানকার কেষ্ট-বিষ্ঠু সকলেই আমাকে দিয়ে ছবি তুলিয়েছেন। এই দেখুন না।'

ঘরের দেয়ালে অনেকগুলি ছবি টাঙানো রহিয়াছে; তন্মধ্যে চেনা লোক মহীধরবাবু এবং অধ্যাপক সোম। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'বাঃ, বেশ ছবি। আপনি দেখছি একজন সত্যিকারের শিল্পী।'

নকুলেশবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'হেঁ হেঁ। ওরে লালু, পাশের দোকান থেকে দু' পেয়ালা চা নিয়ে আয়।'

'চায়ের দরকার নেই, আমরা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি। আপনি কোথাও যাবেন মনে হচ্ছে।'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, দু' দিনের জন্য একবার কলকাতা যাব। বৌ-ছেলে কলকাতায় আছে, তাদের আনতে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, আপনি গোছগাছ করুন।'

রিক্‌শাতে চড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ষ্টেশনে চল।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপার কি? সবাই জোট বেঁধে কলকাতা যাচ্ছে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এই সময় কলকাতার একটা নিদারুণ আকর্ষণ আছে।'

রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ব্রাঞ্চ লাইনের প্রান্তীয় ষ্টেশন, বেশী বড় নয়। এখান হইতে বড় জংশন প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে, সেখানে নামিয়া মেন লাইনের গাড়ি ধরিতে হয়। রেল ছাড়া জংশনে যাইবার মোটর-রাস্তাও আছে; সাহেব সুবা এবং যাহাদের মোটর আছে তাহারা সেই পথে যায়।

ব্যোমকেশ কিন্তু ষ্টেশনে নামিল না, রিক্‌শাওয়ালাকে ইশারা করিতেই সে গাড়ি ঘুরাইয়া বাহিরে লইয়া চলিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হ'ল, নামলে না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করনি, টিকিট-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার ঘটক টিকিট কিনছিল।'

'তাই নাকি?' আমি ব্যোমকেশকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে যেন শুনিতে পায় নাই এমনি ভান করিয়া উত্তর দিল না।

বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে বড় মণিহারীর দোকানটার সামনে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম। ব্যোমকেশ রিক্‌শা থামাইয়া নামিল, আমিও নামিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবার কি মতলব? আরও এসেন্স চাই নাকি?'

সে হাসিয়া বলিল, 'আরে না না—'

'তবে কি কেশতৈল? তরল আলতা?'

'এসই না।'

দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ডেপুটি উষানাথবাবু রহিয়াছেন। তিনি একটা চামড়ার সুটকেস কিনিতেছেন। আমার মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, 'আপনিও কি কলকাতা যাচ্ছেন নাকি?'

উষানাথবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, 'আমি! না, আমি ট্রেজারি অফিসার, আমার কি ষ্টেশন ছাড়বার জো আছে? কে বললে আমি কলকাতা যাচ্ছি?' তাঁহার স্বর কড়া হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সান্ত্বনার সুরে বলিল, 'কেউ বলেনি। আপনি সুটকেস কিনছেন দেখে অজিত ভেবেছিল—। যাক, আপনার পত্নী পেয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।' উষানাথবাবু অসন্তুষ্ট ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইয়া দোকানদারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

আমরা ফিরিয়া গিয়া রিক্‌শাতে চড়িলাম। বলিলাম, 'কি হল? হুজুর হঠাৎ চটলেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি জানি। ওঁর হয়তো মনে মনে কলকাতা যাবার ইচ্ছে, কিন্তু কর্তব্যের দায়ে ষ্টেশন ছাড়তে পারছেন না, তাই মেজাজ গরম। কিংবা—'

রিক্‌শাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, 'আভি কিধর্ যানা হ্যায়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডি. এস. পি পাণ্ডে সাহেব।'

পাণ্ডে সাহেবের বাড়িতেই আপিস। তিনি আমাদের স্বাগত করিলেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সব ঠিক?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সব ঠিক।'

'ট্রেন কখন?'

'রাত্রি সাড়ে দশটায়। সওয়া এগারটায় জংশন পৌঁছবে।'

'কলকাতার ট্রেন কখন?'

'পৌনে বারটায়।'

'আর পশ্চিমের মেল?'

'এগারটা পঁয়ত্রিশ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ। তাহলে ওবেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় আমি মহীধরবাবুর বাড়িতে যাব। আপনি সাড়ে পাঁচটার সময় যাবেন। মহীধরবাবু যদি আমার অনুরোধ না রাখেন, পুলিশের অনুরোধ নিশ্চয় অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।'

গম্ভীর হাসিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'আমারও তাই বিশ্বাস।'

ইহাদের টেলিগ্রাফে কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম হইল না। কিন্তু প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই ; জানি প্রশ্ন করিলেই ব্যোমকেশ জিভ কাটিয়া বলিবে—পুলিশের গুপ্তকথা।

পাণ্ডের আপিস হইতে ব্যাঙ্কে গেলাম। কিছু টাকা বাহির করিবার ছিল।

ব্যাঙ্কে খুব ভিড় ; আগামী দুই দিন বন্ধ থাকিবে। তবু ক্ষণেকের জন্য অমরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি বলিলেন, 'এই বেলা যা দরকার টাকা বার করে নিন। কাল পরশু ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি ফিরছেন কবে ?'

'পরশু রাত্রেই ফিরব।'

কাজের সময়, একজন কেরানী তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা টাকা বাহির করিয়া ফিরিতেছি, দেখিলাম ডাক্তার ঘটক ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিল। সে আমাদের দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু যেন দেখিতে পায় নাই এমনি ভাবে গিয়া একটা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ আমার দিকে চাহিয়া সহাস্য চক্ষুদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিল। তারপর রিক্শাতে চড়িয়া বসিয়া বলিল, 'ঘর্ চলো।'

১১

অপরাহ্ন পাঁচটার সময় আমি আর ব্যোমকেশ মহীধরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। তিনি বসিবার ঘরে ছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে। মুখের ফুটি-ফাটা হাসিটি ম্রিয়মাণ, চালতার মতন গাল দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

বলিলেন 'আসুন আসুন। অনেকদিন বাঁচবেন, ব্যোমকেশবাবু, এইমাত্র আপনার কথা ভাবছিলাম। শরীর বেশ সেরে উঠেছে দেখছি। বাঃ, বেশ বেশ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনার শরীর তো ভাল দেখছি না।'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'হয়েছিল একটু শরীর খারাপ—এখন ভালই। কিন্তু একটা বড় ভাবনার কারণ হয়েছে ব্যোমকেশবাবু।'

'কি হয়েছে?'

'রজনী কাল রাত্রে কলকাতা চলে গেছে।'

'সে কি! একলা গেছেন? আপনাকে না বলে?'

'না না, সে সব কিছু নয়। বাড়ির পুরোনো চাকর রামদীনকে তার সঙ্গে দিয়েছি।'

'তবে ভাবনাটা কিসের?'

মহীধরবাবুর মনে ছল চাতুরী নাই। সোজাসুজি বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'শুনুন, বলি তাহলে। কলকাতায় রজনীর এক মাসী থাকেন, তিনিই ওকে মানুষ করেছেন। কাল বিকেলে ওর মেসোর এক 'তার' এল। তিনি রজনীকে ডেকে পাঠিয়েছেন—মাসীর ভারি অসুখ। রজনীকে রাত্তিরের গাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। ও এমন প্রায়ই যাতায়াত করে, পাঁচ ছ' ঘণ্টার রাস্তা বৈ তো নয়। রজনী আজ সকালে কলকাতায় পৌঁছে গেছে, 'তার' পেয়েছি।

'এ পর্যন্ত কোনোও গোলমাল নেই। তারপর শুনুন। আজ সকালে দু'খানা চিঠি পেলাম; তার মধ্যে একখানা রজনীর মাসীর হাতের লেখা—কালকের তারিখ। তিনি নিতান্ত মামুলী চিঠি লিখেছেন, অসুখ-বিসুখের কোনোও কথাই নেই।'

মহীধরবাবু শঙ্কিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'এমনও তো হতে পারে চিঠি লেখবার পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'তা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু অন্য চিঠিখানার কথা এখনও বলি নি। বেনামী চিঠি। এই পড়ে দেখুন।'

তিনি একটি খাম ব্যোমকেশকে দিলেন। খামের উপর ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া বোঝা যায় এই শহরেই ডাকে দেওয়া হইয়াছে। ব্যোমকেশ চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। সাদা এক তক্তা কাগজের উপর মাত্র কয়েকটি কথা লেখা ছিল—

আপনার চোখের আড়ালে একজন ভদ্রবেশী দুষ্ট লোক আপনার কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছে। ইহারা যদি ইলোপ করে, কেলেঙ্কারীর একশেষ হইবে। সাবধান! ডাক্তার ঘটককে বিশ্বাস করিবেন না।

ব্যোমকেশ চিঠি পড়িয়া ফেরত দিল। মহীধরবাবু কম্পিত স্বরে বলিলেন, 'কে লিখেছে জানি না। কিন্তু এ যদি সত্যি হয়—'

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে আপনি জানেন। সে এমন কাজ করবে বলে আপনার মনে হয়?'

মহীধরবাবু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'ডাক্তারকে তো ভাল ছেলে বলেই জানি; যখন তখন আসে আমার বাড়িতে। তবে পরচিত্ত অন্ধকার। আচ্ছা, সে কি আছে এখানে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে। আজ সকালেই তাকে দেখেছি।'

মহীধরবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আছে? যাক, তাহলে বোধ হয় কেউ মিথ্যে বেনামী চিঠি দিয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার কিন্তু আজ রাত্রে কলকাতা যাচ্ছে।'

মহীধরবাবু আবার ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ—যাচ্ছে! তবে—?'

ব্যোমকেশ দৃঢ় স্বরে বলিল, 'মহীধরবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনোও কেলেঙ্কারী হবে না। আপনি মিথ্যে ভয় করছেন।'

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'সত্যি বলছেন? কিন্তু আপনি কি করে জানলেন—আপনি তো—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি এমন অনেক কথা জানি যা আপনি জানেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি না। রজনী দেবী দু'দিন পরেই ফিরে আসেবেন। তিনি এমন কোনোও কাজ করবেন না যাতে আপনার মাথা হেঁট হয়।'

মহীধরবাবু গদগদ স্বরে বলিলেন, 'ব্যস, তা হলেই হল। ধন্যবাদ ব্যোমকেশবাবু। আপনার কথায় যে কত দূর নিশ্চিন্ত হলাম তা বলতে পারি না। বুড়ো হয়েছি—ভগবান একবার দাগা দিয়েছেন—তাই একটুতেই ভয় হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকথা ভুলে যান। আমি এসেছি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে।'

মহীধরবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'বলুন বলুন।'

'আপনার মোটরখানা আজ রাত্রে একবার দিতে হবে। জংশনে যাব। একটু জরুরী কাজ আছে।'

'এ আর বেশী কথা কি ? কখন চাই বলুন ?'

'রাত্রি ন'টার সময়।'

'বেশ, ঠিক ন'টার সময় আমার গাড়ি আপনার বাড়ির সামনে হাজির থাকবে। আর কিছু ?'

'আর কিছু না।'

এই সময় পাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া চা ও প্রচুর জলখাবার ধ্বংস করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

ঠিক ন'টার সময় মহীধরবাবুর আট সিলিণ্ডার গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে আসিয়া থামিল। আমি, ব্যোমকেশ ও পাণ্ডে সাহেব তাহাতে চাপিয়া বসিলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। একটি কালো রঙের পুলিস ভ্যান্ আগে হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, সেটি আমাদের পিছু লইল।

শহরের সীমানা অতিক্রম করিয়া আমাদের মোটর জংশনের দীর্ঘ গৃহহীন পথ ধরিল। দুই পাশে কেবল বড় বড় গাছ ; আমাদের গাড়ি তাহার ভিতর আলোর সুড়ঙ্গ রচনা করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

পথে বেশী কথা হইল না। তিনজনে পাশাপাশি বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট টানিয়া চলিয়াছি। একবার ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার আসামী ফার্ষ্টক্লাসের টিকিট কিনবে।'

'হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়। যে ক্লাসেই উঠুক, ইন্সপেক্টর দুবে পাশের কামরায় থাকবে।'

'পুলিস মহলে আসল কথা কে কে জানে ?'

'আমি আর দুবে। পাছে আগে থাকতে বেশী হৈ চৈ হয় তাই চুপিসাড়ে মহীধরবাবুর গাড়ি নিতে হল। পিছনের ভ্যানে যারা আছে তারাও জানে না কি জন্যে কোথায় যাচ্ছি। পুলিসের থানা থেকে যত কথা বেরোয় এত আর কোথাও থেকে নয়। ঘুষখোর পুলিস তো আছেই। তা ছাড়া পুলিসের পেটে কথা থাকে না।'

পুরন্দর পাণ্ডে নির্মলচরিত্র পুরুষ, তাই স্বজাতি সম্বন্ধেও তিনি সত্যবাদী।

দশটার সময় জংশনে পৌঁছিলাম। লাল সবুজ অসংখ্য আকাশ-প্রদীপে ষ্টেশন ঝলমল করিতেছে।

পুলিসের ভ্যানে দুইজন সব্-ইন্‌স্পেক্টর ও কয়েকটি কনষ্টেবল ছিল। পাণ্ডে তাহাদের ষ্টেশনের ভিতরে বাহিরে নানা স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন; তারপর ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিলেন। বলিলেন, 'আমার একটা 'লগ' আসবার কথা আছে। এলেই খবর দেবেন। আমরা ওয়েটিং রুমে আছি।'

আমরা তিন জনে ফার্ষ্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে গিয়া বসিলাম। পাণ্ডে ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখিতে লাগিলেন।

ঠিক সাড়ে দশটার সময় ষ্টেশন মাষ্টার খবর দিলেন, 'লগ' এসেছে। সব ভাল। ফার্ষ্ট ক্লাস।'...

এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় যত দীর্ঘই হোক, প্রাকৃতিক নিয়মে শেষ হইতে বাধ্য। গাড়ি আসার ঘণ্টা বাজিল। আমরা প্ল্যাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের সকলের গায়ে ওভারকোট এবং মাথায় পশমের টুপি, সুতরাং সহসা দেখিয়া কেহ যে চিনিয়া ফেলিবে সে সম্ভাবনা নাই।

তারপর বহু প্রতীক্ষিত গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

পাণ্ডে সাহেব নাটকের রঙ্গমঞ্চ ভালই নির্বাচন করিয়াছিলেন। আয়োজনেরও কিছু ত্রুটি রাখেন নাই; কিন্তু তবু নাটক জমিতে পাইল না, পটোত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িয়া গেল।

গাড়ির প্রথম শ্রেণীর কামরা যেখানে থামে আমরা সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলাম। ঠিক আমাদের সামনে প্রথম শ্রেণীর কামরা দেখা গেল। জানালাগুলির কাঠের কবাট বন্ধ, তাই অভ্যন্তরভাগ দেখা গেল না। অল্পকালমধ্যে দরজা খুলিয়া গেল। একজন কুলি ছুটিয়া গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দুইটি বড় বড় চামড়ার সুটকেস নামাইয়া রাখিল।

কামরায় একটি মাত্র যাত্রী ছিলেন, তিনি এবার বাহির হইয়া আসিলেন। কোটপ্যান্ট-পরা অপরিচিত ভদ্রলোক, গোঁফ দাড়ি কামানো, চোখে ফিকা নীল চশমা। তিনি সুটকেস দুটি কুলির মাথায় তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, পাণ্ডে এবং ব্যোমকেশ তাঁহার দুই পাশে গিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ একটু দুঃখিত স্বরে বলিল, 'অমরেশবাবু, আপনার যাওয়া হল না, ফিরে যেতে হবে।'

অমরেশবাবু! ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা! গোঁফদাড়ি কামানো মুখ দেখিয়া একেবারে চিনিতে পারি নাই।

অমরেশ রাহা একবার দক্ষিণে একবার বামে ঘাড় ফিরাইলেন, তারপর ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া নিজের কপালে ঠেকাইয়া ঘোড়া টানিলেন। চড়াৎ করিয়া শব্দ হইল।

মুহূর্ত-মধ্যে অমরেশ রাহার ভূপতিত দেহ ঘিরিয়া লোক জমিয়া গেল। পাণ্ডে হুইসল বাজাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের বহু লোক আসিয়া স্থানটা ঘিরিয়া ফেলিল। পাণ্ডে কড়া সুরে বলিলেন, 'ইন্‌স্পেক্টর দুবে, সুটকেস দুটো আপনার জিম্মায়।'

একজন লোক ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। চিনিলাম, ডাক্তার ঘটক। সে বলিল, 'কি হয়েছে? এ কে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'অমরেশ রাহা। দেখুন তো বেঁচে আছে কি না।'

ডাক্তার ঘটক নত হইয়া দেহ পরীক্ষা করিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'মারা গেছে।'

ভিড়ের ভিতর হইতে দন্তবাদ্যসহযোগে একটা বিস্ময়-কুতূহলী স্বর শোনা গেল, 'অমরেশ রাহা মারা গেছে—অ্যাঁ! কি হয়েছিল? তার দাড়ি কোথায়—অ্যাঁ—!'

ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার।

ডাক্তার ঘটক ও নকুলেশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের গাড়িও এসে পড়েছে। এখন বলবার সময় নেই, ফিরে এসে শুনবেন।'

১২

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা সাংঘাতিক ভুল করেছিলাম। অমরেশ রাহা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তার যে পিস্তলের লাইসেন্স থাকতে পারে একথা মনেই আসে নি।'

সত্যবতী বলিল, 'না, গোড়া থেকে বল।'

২রা জানুয়ারী। কলিকাতায় ফিরিয়া চলিয়াছি। ডি. এস. পি পাণ্ডে, মহীধরবাবু ও রজনী ষ্টেশনে আসিয়া আমাদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এতক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত মনে একত্র হইতে পারিয়াছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুটো জিনিস জট পাকিয়ে গিয়েছিল—এক, ছবি চুরি; দ্বিতীয়, ডাক্তার আর রজনীর গুপ্ত প্রণয়। ওদের প্রণয় গুপ্ত হলেও তাতে নিন্দের কিছু ছিল না। ওরা কলকাতায় গিয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে। সম্ভবতঃ রজনীর মাসী আর মেসো জানেন, আর কেউ জানে না; মহীধরবাবুও না। তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন কেউ জানবে না। মহীধরবাব সেকেলে লোক নয়, তবু বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে সাবেক সংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি। তাই ওরা লুকিয়ে বিয়ে করে সব দিক রক্ষে করেছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খবরটা কি ডাক্তারের কাছে পেলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উঁহু। ডাক্তারকে ঘাঁটাইনি, ও যে রকম রুখে ছিল, কিছু বলতে গেলেই কামড়ে দিত। আমি রজনীকে আড়ালে বলেছিলাম, সব জানি। সে জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যোমকেশবাবু, আমরা কি অন্যায় করেছি? আমি বলেছিলাম—না। তোমরা যে বিদ্রোহের ঝোঁকে মহীধরবাবুকে দুঃখ দাও নি, এতেই তোমাদের গৌরব। উগ্র বিদ্রোহে বেশী কাজ হয় না, কেবল বিরুদ্ধ শক্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়। বিদ্রোহের সঙ্গে সহিষ্ণুতা চাই। তোমরা সুখী হবে।'

সত্যবতী বলিল, 'তারপর বল।'

ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল, 'ছবিচুরির ব্যাপারটাকে যদি হাল্কা ভাবে নাও তা হলে তার অনেক রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু যদি গুরুতর ব্যাপার মনে কর, তাহলে তার একটিমাত্র ব্যাখ্যা হয়—ঐ গ্রুপের মধ্যে এমন একজন আছে যে নিজের চেহারা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চায়।'

'কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?—একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে ওই দলে একজন দাগী আসামী আছে যে নিজের ছবির প্রচার চায় না। প্রস্তাবটা কিন্তু টেক্‌সই নয়। ঐ গ্রুপে যারা আছে তারা কেউ লুকিয়ে বেড়ায় না, তাদের সকলেই চেনে। সুতরাং ছবি চুরি করার কোনোও মানে হয় না।

'দাগী আসামীর সম্ভাবনা ত্যাগ করতে হচ্ছে। কিন্তু যদি ঐ দলে এমন কেউ থাকে যে ভবিষ্যতে দাগী আসামী হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, অর্থাৎ একটা গুরুতর অপরাধ করে কেটে পড়বার চেষ্টায় আছে, তা হলে সে নিজের ছবি লোপাট করবার চেষ্টা করবে। অজিত, তুমি ত লেখক, শুধু ভাষার দ্বারা একটা লোকের এমন হুবহু বর্ণনা দিতে পার যাতে তাকে দেখলেই চেনা যায়?—পারবে না; বিশেষতঃ তার চেহারা যদি মামুলী হয় তাহলে একেবারেই পারবে না। কিন্তু একটা ফটোগ্রাফ মুহূর্তমধ্যে তার চেহারাখানা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে। তাই দাগী আসামীদের ফটো পুলিসের ফাইলে রাখা থাকে।'

'তাহলে পাওয়া গেল, ঐ দলের একটা লোক গুরুতর অপরাধ করে ডুব মারবার ফন্দি আঁটছে। এখন প্রশ্ন এই—সংকল্পিত অপরাধটা কি এবং লোকটা কে?'

'গ্রুপের লোকগুলিকে একে একে ধরা যাক।—মহীধরবাবু ডুব মারবেন না; তাঁর বিপুল সম্পত্তি আছে, চেহারাখানাও ডুব মারবার অনুকূল নয়। ডাক্তার ঘটক রজনীকে নিয়ে উধাও হতে পারে কিন্তু রজনী সাবালিকা, তাকে নিয়ে পালানো আইন-ঘটিত অপরাধ নয়। তবে ছবি চুরি করতে যাবে কেন? অধ্যাপক সোমকেও বাদ দিতে পার। সোম যদি শিকল কেটে ওড়বার সঙ্কল্প করতেন তাহলেও স্রেফ ঐ ছবিটা চুরি করার কোনোও মানে হত না। সোমের আরও ছবি আছে; নকুলেশবাবুর ঘরে তাঁর ফটো টাঙানো আছে আমরা দেখেছি। তারপর ধর নকুলেশবাবু; তিনি পিক্‌নিকের দলে ছিলেন। তিনি মহীধরবাবুর কাছে মোটা টাকা ধার করেছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে গা-ঢাকা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তিনি ফটো তুলেছিলেন, ফটোতে তাঁর চেহারা ছিল না। অতএব তাঁর পক্ষে ফটো চুরি করতে যাওয়া বোকামি।

'বাকি রয়ে গেলেন ডেপুটি উষানাথবাবু এবং ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার অমরেশ রাহা। একজন সরকারী মালখানার মালিক, অন্যজন ব্যাঙ্কের কর্তা। দেখা যাচ্ছে, ফেরার হয়ে যদি কারুর লাভ থাকে ত এঁদের দু'জনের। দু'জনের হাতেই বিস্তর পরের টাকা; দু'জনেই চিনির বলদ।

'প্রথমে উষানাথবাবুকে ধর। তাঁর স্ত্রী-পুত্র আছে; চেহারাখানাও এমন যে ফটো না থাকলেও তাঁকে সনাক্ত করা চলে। তিনি চোখে কালো চশমা পরেন, চশমা খুললে দেখা যায় তাঁর একটা চোখ কানা। বেশীদিন পুলিসের সন্ধানী চক্ষু এড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, তাঁর চরিত্রও এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করার প্রতিকূল।

'বাকি রইলেন অমরেশ রাহা। এটা অবশ্য নেতি প্রমাণ। কিন্তু তারপর তাঁকে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। তাঁর চেহারা নিতান্ত সাধারণ, তাঁর মত লক্ষ লক্ষ বৈশিষ্ট্যহীন লোক পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছেন। এ রকম দাড়ি রাখার সুবিধে, দাড়ি কামিয়ে ফেললেই চেহারা বদলে যায়, তখন চেনা লোক আর চিনতে পারে না। নকল দাড়ি পরার চেয়ে তাই আসল দাড়ি কামিয়ে ফেলা ছদ্মবেশ হিসেবে ঢের বেশী নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য।

অমরেশবাবু অবিবাহিত ছিলেন। তিনি মাইনে ভালই পেতেন, তবু তাঁর মনে দারিদ্র্যের ক্ষোভ ছিল; টাকার প্রতি দুর্দম আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল। আমার মনে হয় তিনি অনেকদিন ধরে এই কু-মতলব আঁটছিলেন। তাঁর আলমারিতে গুজরাটী বই দেখেছিলে মনে আছে? তিনি চেষ্টা করে গুজরাটী ভাষা শিখেছিলেন; হয়ত সংকল্প ছিল টাকা নিয়ে বোম্বাই অঞ্চলে গিয়ে বসবেন। বাঙালীদের সঙ্গে গুজরাটিদের চেহারার একটা ধাতুগত ঐক্য আছে, ভাষাটাও রপ্ত থাকলে কেউ তাঁকে সন্দেহ করতে পারবে না।

'সবদিক ভেবে আঁটঘাট বেঁধে তিনি তৈরি হয়েছিলেন। তারপর যখন সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করবার সময় হ'ল তখন হঠাৎ কতকগুলো অপ্রত্যাশিত বাধা উপস্থিত হল। পিক্‌নিকের দলে গিয়ে তাঁকে ছবি তোলাতে হল। তিনি অনিচ্ছাভাবে ছবি তুলিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু না তোলালে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। ভাবলেন, ছবি চুরি করে সামলে নেবেন।

'যাহোক, তিনি মহীধরবাবুর বাড়ি থেকে ছবি চুরি করলেন। পরদিন চায়ের পার্টিতে আমরা উপস্থিত ছিলাম; সেখানে যে সব আলোচনা হল

তাতে অমরেশবাবু বুঝলেন তিনি একটা ভুল করেছেন। স্রেফ্ ছবিখানা চুরি করা ঠিক হয়নি। তাই পরের বার যখন তিনি উষানাথবাবুর বাড়িতে চুরি করতে গেলেন তখন আর কিছু না পেয়ে পরী চুরি করে আনলেন। আলমারিতে চাবি ঢুকিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন যাতে মনে হয় ছবি চুরি করাটা চোরের মূল উদ্দেশ্য নয়। অধ্যাপক সোমের ছবিটা চুরি করার দরকার হয়নি। আমার বিশ্বাস তিনি কোনোও উপায়ে জানতে পেরেছিলেন যে, মালতী দেবী ছবিটা আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে, তিনি ছবি চুরি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু ছবি তার আগেই নষ্ট করা হয়েছিল। হয়ত তিনি ছেঁড়া ছবির টুকরোগুলো পেয়েছিলেন।

'আমার আবির্ভাবে অমরেশবাবু শঙ্কিত হননি। তাঁর মূল অপরাধ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে; তিনি টাকা নিয়ে উধাও হবার পর সবাই জানতে পারবে, তখন আমি জানলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ফাল্গুনী পালের প্রেতমূর্তি যখন এসে দাঁড়াল, তখন অমরেশবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তাঁর সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যাবার উপক্রম হল। ফাল্গুনী থাকতে ফটো চুরি করে কি লাভ? সে স্মৃতি থেকে ছবি এঁকে ফটোর অভাব পূরণ করে দেবে।

'কিন্তু পরকীয়া-প্রীতির মত বেআইনী কাজ করার একটা তীব্র উত্তেজনা আছে। অমরেশবাবু তার স্বাদ পেয়েছিলেন। তিনি এতদূর এগিয়ে আর পেছুতে পারছিলেন না। তাই ফাল্গুনী যেদিন তাঁর ছবি এঁকে দেখাতে এল সেদিন তিনি ঠিক করলেন ফাল্গুনীর বেঁচে থাকা চলবে না। সেইরাত্রে তিনি মদের বোতলে বেশ খানিকটা আফিম মিশিয়ে নিয়ে ফাল্গুনীর কুঁড়ে ঘরে গেলেন। ফাল্গুনীকে নেশার জিনিস খাওয়ানো শক্ত হল না। তারপর সে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ল তখন তাকে তুলে কুয়োয় ফেলে দিলেন। আগের রাত্রে চুরি-করা পরীটা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, সেটাও কুয়োর মধ্যে গেল; যাতে পুলিস ফাল্গুনীকেই চোর বলে মনে করে। এই ব্যাপার ঘটেছিল সম্ভবতঃ রাত্রি এগারোটার পর, যখন বাগানের অন্য কোণে আর একটি যন্ত্রণা-সভা শেষ হয়ে গেছে।

'পোষ্ট মর্টেম-রিপোর্ট থেকে মনে হয় ফাল্গুনী জলে পড়বার আগেই

মরে গিয়েছিল। কিন্তু অমরেশবাবুর বোধ হয় ইচ্ছে ছিল সে বেঁচে থাকতে থাকতেই তাকে জলে ফেলে দেন, যাতে প্রমাণ হয় সে নেশার ঝোঁকে অপঘাতে জলে ডুবে মরেছে।

'যাহোক অমরেশবাবু নিষ্কণ্টক হলেন। যে ছবিটা তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন, রওনা দেবার আগে সেটা পুড়িয়ে ফেললেই নিশ্চিন্ত, আর তাঁকে সনাক্ত করবার কোনোও চিহ্ন থাকবে না।

'আমি যখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলাম এ অমরেশবাবুর কাজ, তখন পাণ্ডে সাহেবকে সব কথা বললাম। ভারি বুদ্ধিমান লোক, চট করে ব্যাপার বুঝে নিলেন। সেই থেকে এক মিনিটের জন্যেও অমরেশ বাবু পুলিসের চোখের আড়াল হতে পারেন নি।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল।

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, অমরেশ রাহা যে ঠিক ঐ দিনই পালাবে, এটা, বুঝলে কি করে? অন্য যে কোনোও দিন পালাতে পারত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা কোনোও ছুটির আগে পালানোর সুবিধে আছে, দু'দিন সময় পাওয়া যায়। দু'দিন পরে ব্যাঙ্ক খুললে যখন চুরি ধরা পড়বে, চোর তখন অনেক দূরে। অবশ্য বড়দিনের ছুটিতেও পালাতে পারত; কিন্তু তার দিক থেকে নববর্ষের ছুটিতেই পালানোর দরকার ছিল। অমরেশ রাহা যে-ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল সেটা কলকাতার একটা বড় ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিস। প্রত্যেক মাসের শেষে এখানে হেড আপিস থেকে মোটা টাকা আসত; কারণ পরের মাসের আরম্ভেই ব্যাঙ্কের টাকায় টান পড়বে। সাধারণ লোক ছাড়াও এখানে কয়েকটা খনি আছে, তাতে অনেক কর্মী কাজ করে, মাসের পয়লা তাদের মাইনে দিতে হয়। এবার সেই মোটা টাকাটা ব্যাঙ্কে এসেছিল বড়দিনের ছুটির পর। বড়দিনের ছুটির আগে পালালে অমরেশ রাহা বেশী টাকা নিয়ে যেতে পারত না! তার দুটি সুটকেশ থেকে এক লাখ আশী হাজার টাকার নোট পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ লম্বা হইয়া শুইল, বলিল, 'আর কোনোও প্রশ্ন আছে?'

'দাড়ি কামালো কখন? ট্রেনে?'

'হ্যাঁ। সেইজন্যেই ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কিনেছিল। ফার্স্ট ক্লাসে সহযাত্রীর সম্ভাবনা কম।'

সত্যবতী বলিল, 'মহীধরবাবুকে বেনামী চিঠি কে দিয়েছিল ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রোফেসর সোম। কিন্তু বেচারার প্রতি অবিচার কোরো না। লোকটি শিক্ষিত এবং সজ্জন, এক ভয়ঙ্করী স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে তাঁর জীবনটা নষ্ট হতে বসেছে। সোম সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিকেও কিছু হ'ল না, ডাক্তার ঘটকের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হেরে গেলেন। তাই ঈর্ষার জ্বালায়—। ঈর্ষার মতন এমন নীচ প্রবৃত্তি আর নেই। কাম ক্রোধ লোভ—ষড়রিপুর মধ্যে সব চেয়ে অধম হচ্ছে মাৎসর্য।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মালতী দেবীর অসুখের খুবই বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। কারুর মৃত্যু-কামনা করতে নেই, কিন্তু মালতী দেবী যদি সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে এই বেলা স্বর্গারোহণ করেন তাহলে অন্তত আমি অসুখী হব না।'

আমিও মনে মনে সায় দিলাম।

দুর্গরহস্য

পূর্বখণ্ড

১

ব্যোমকেশের শরীর সারাইবার জন্য সাঁওতাল পরগণার যে শহরে হাওয়া বদলাইতে গিয়াছিলাম, বছর না ঘুরিতেই যে আবার সেখানে যাইতে হইবে, তাহা ভাবি নাই। এবার কিন্তু স্বাস্থ্যের অন্বেষণে নয়, পুরন্দর পাণ্ডে মহাশয় যে নূতন শিকারের সন্ধান দিয়াছিলেন তাহারই অন্বেষণে ব্যোমকেশ ও আমি বাহির হইয়াছিলাম।

প্রথমবার যখন এ শহরে যাই, তখন এখানকার অনেকগুলি বাঙালীর সহিত পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু শহরের বাহিরেও যে একটি ধনী বাঙালী পরিবার বাস করেন, তাহা কেহ বলে নাই। এই পরিবারটিকে লইয়া এই বিচিত্র কাহিনী। সুতরাং তাহার কথাই সর্বাগ্রে বলিব। সব কথা অবশ্য একসঙ্গে জানিতে পারি নাই, ছাড়া-ছাড়া ভাবে কয়েকজনের মুখে শুনিলাম। পাঠকের সুবিধার জন্য আরম্ভেই সেগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া দিলাম।

শহরের দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ জংশন হইতে বিপরীত মুখে প্রায় ছয় মাইল পর্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে। রাস্তাটি বহু পুরাতন, বাদশাহী আমলের। বড় বড় চৌকশ পাথর দিয়া আচ্ছাদিত; পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঘাস ও আগাছা জন্মিয়াছে, কিন্তু তবু রাস্তার উপর দিয়া মোটর চালানো যায়। দুই পাশের শিলাকর্কশ বন্ধুরতাকে দ্বিধা ভিন্ন করিয়া পথ এখনও নিজের কঠিন অস্তিত্ব বজায় রখিয়াছে।

এই পথের সর্পিল গতি যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেখানে পাশাপাশি দুটি ক্ষুদ্র গিরিচূড়া। কালিদাসের বর্ণনা মনে পড়ে, 'মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ।' বেশী উঁচু নয়, কিন্তু দুটি চূড়ার মাঝখানে খাঁজ পড়িয়াছে। উপমা কালিদাসস্য বাদ দিলেও দৃশ্যটি লোভনীয়।

চূড়া দুটি নিরাভরণ নয়। একটির মাথায় প্রাচীন কালের এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ; অন্যটির শীর্ষে আধুনিক কালের চুনকাম করা বাড়ি। বাড়ি এবং দুর্গের মালিক শ্রীরামকিশোর সিংহ সপরিবারে এই স্থানে বাস করেন।

এইখানে প্রাচীন দুর্গ ও তাহার আধুনিক মালিকের কিছু পরিচয় আবশ্যক। নবাব আলিবর্দীর আমলে জানকীরাম নামক জনৈক দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি রাজা জানকীরাম খেতাব পাইয়া কিছুকাল সুবা বিহার শাসন করিয়াছিলেন এবং প্রভূত ধন-সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে তখন ক্রান্তিকাল আরম্ভ হইয়াছে; ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল বাদশাহী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; দুর্দম মারাঠা বর্গী বারম্বার বাঙলা বিহারে হানা দিয়া চারিদিক ছারখার করিয়া দিতেছে, ইংরেজ বণিক বাণিজ্যের খোলস ছাড়িয়া রাজদণ্ডের দিকে হাত বাড়াইতেছে। দেশজোড়া অশান্তি; রাজা প্রজা ধনীদরিদ্র কাহারও চিত্তে সুখ নাই। রাজা জানকীরাম কুশাগ্রবুদ্ধি লোক ছিলেন; তিনি এই দুর্গম গিরি-সঙ্কটের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ তৈয়ার করাইয়া তাঁহার বিপুল ধনসম্পত্তি এবং পরিবারবর্গকে এইখানে রাখিলেন।

তারপর রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল প্লাবনে অনেক কিছুই ভাসিয়া গেল। কিন্তু জানকীরামের এই নিভৃত দুর্গ নিরাপদে রহিল। তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে এখানে বাস করিতে লাগিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর আরও একশত বছর কাটিয়া গেল।

কোম্পানীর শাসনে দেশ অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে। জানকীরামের দুর্গে তাঁহার অধস্তন চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষ বিদ্যমান—রাজারাম ও তৎপুত্র জয়রাম। রাজারাম বয়স্থ ব্যক্তি, পুত্র জয়রাম যুবক। পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থ ও পারিপার্শ্বিক জমিদারীর আয় হইতে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা চলিতেছে। সঞ্চিত অর্থ এই কয় পুরুষে হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া আরও বাড়িয়াছে। জানকীরামের বংশধরদের স্বভাব ছিল টাকা হাতে আসিলেই তাহা স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া রাখা; এইভাবে রাশি রাশি মোহর আসরফি তৈজস সঞ্চিত হইয়া ছিল। কাহারও কোনোওপ্রকার বদ্‌খেয়াল ছিল না। এই জঙ্গলের মধ্যে বিলাস-ব্যসনের অবকাশ কোথায়?

হঠাৎ দেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন কেবল নগরগুলির মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না। দাবানলের মত বনে জঙ্গলেও প্রসারিত হইল।

রাজারাম সংসারের কর্তা, তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। চারিদিকে লুটতরাজ; কোথাও ইংরেজ দলের সিপাহীরা লুঠ করিতেছে, কোথাও বিদ্রোহী সিপাহীরা লুঠ করিতেছে। রাজারাম খবর পাইলেন একদল সিপাহী এইদিকে আসিতেছে। তিনি সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু সম্পত্তি রক্ষা করিবেন কী উপায়ে? শতবর্ষের পুরাতন দুর্গটি সুশিক্ষিত আগ্নেয়াস্ত্রধারী শত্রুর আক্রমণ রোধ করিতে সমর্থ নয়। দুর্গের জীর্ণ তোরণদ্বার একটি গোলার আঘাতেই উড়িয়া যাইবে। দুর্গে একটি বড় কামান আছে বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল অব্যবহারের ফলে উহা মরিচা পড়িয়া অকর্মণ্য হইয়াছে, উহার গোড়ার দিকের লৌহকপাট এমন জাম হইয়া গিয়াছে যে খোলা যায় না। তাছাড়া যে-কয়টি গাদা বন্দুক আছে, তাহার দ্বারা জঙ্গলে হরিণ শিকার বা চোর তাড়ানো চলিতে পারে, লুণ্ঠন-লোলুপ সিপাহীর দলকে ঠেকাইয়া রাখা একেবারেই অসম্ভব।

রাজারাম উপযুক্ত পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিবারস্থ নারী ও শিশু-দের স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। দুর্গ হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি সাঁওতাল পল্লী ছিল, স্ত্রী পুত্র-বধূ ও দুই তিনটি নাতি-নাতনীকে সেইখানে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গের সমস্ত ভৃত্য ও কর্মচারী সেই সঙ্গে গেল; কেবল পুত্র জয়রাম সহ রাজারাম দুর্গে রহিলেন। বিদায়-কালে রাজারাম গৃহিণীর অঞ্চলে কয়েকটি মোহর বাঁধিয়া দিলেন। বেশী মোহর দিতে সাহস হইল না, কি জানি বেশী সোনার লোভে পরিচরেরাই যদি বেইমানি করে। তারপর তাহারা প্রস্থান করিলে পিতাপুত্র মিলিয়া সঞ্চিত সোনা লুকাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিন দিন পরে ফিরিঙ্গী নায়কের অধীনে একদল সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজারামের বোধহয় ইচ্ছা ছিল, সোনা দানা লুকাইয়া রাখিয়া নিজেও পুত্রকে লইয়া দুর্গ হইতে অন্তর্হিত হইবেন; কিন্তু তাঁহারা পলাইতে পারিলেন না। সিপাহীরা অতর্কিতে উপস্থিত হইয়া নির্বিবাদে দুর্গে প্রবেশ করিল।

তারপর দুর্গের মধ্যে কি হইল কেহ জানে না। দুই দিন পরে সিপাহীরা চলিয়া গেল। রাজারাম ও জয়রামকে কিন্তু ইহলোকে আর কেহ দেখিল না। শূন্য দুর্গ পড়িয়া রহিল।

ক্রমে দেশ শান্ত হইল। কয়েক মাস পরে রাজারামের পরিবার ও অনুচরগণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল দুর্গের পাথরগুলি ছাড়া আর কিছুই নাই; তুলিয়া লইয়া যাইবার মত যাহা কিছু ছিল সিপাহীরা লইয়া গিয়াছে। দুর্গের স্থানে স্থানে, এমন কি ঘরের মেঝেয় সিপাহীরা পাথর তুলিয়া গর্ত খুঁড়িয়াছে; বোধকরি ভূ-প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়াছে। কিছু পাইয়াছে কিনা অনুমান করা যায় না, কারণ রাজারাম কোথায় ধনরত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা কেবল তিনি এবং জয়রাম জানিতেন। হয়তো সিপাহীরা সব কিছুই লুটিয়া লইয়া গিয়াছে; হয়তো কিছুই পায় নাই, তাই পিতাপুত্রকে হত্যা করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অসহায়া দুইটি নারী কয়েকটি শিশুকে লইয়া কিছুকাল দুর্গে রহিল, কিন্তু যে দুর্গ একদিন গৃহ ছিল তাহা এখন শ্মশান হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে ভৃত্য ও কর্মচারীরা একে একে খসিয়া পড়িতে লাগিল; কারণ সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য শুধু গৃহই যথেষ্ট নয়, অন্নবস্ত্রেরও প্রয়োজন। অবশেষে একদিন দুইটি বিধবা শিশুগুলির হাত ধরিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা কোথায় গিয়া আশ্রয় পাইল তাহার কোনোও ইতিহাস নাই। সম্ভবতঃ বাংলা দেশে কোনোও দুর আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় পাইল। পরিত্যক্ত দুর্গ শৃগালের বাসভূমি হইল।

অতঃপর প্রায় ষাট বছর এই বংশের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বংশের দুইটি যুবক আবার মাথা তুলিলেন। রামবিনোদ ও রামকিশোর সিংহ দুই ভাই। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহারা মানুষ হইয়াছিলেন, কিন্তু বংশের ঐতিহ্য ভোলেন নাই। দুই ভাই ব্যবসা আরম্ভ করিলেন, এতদিন পরে কমলা আবার তাঁহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথমে ঘৃতের, পরে লোহার কারবার করিয়া তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিলেন।

বড় ভাই রামবিনোদ কিন্তু বেশীদিন বাঁচিলেন না। যৌবনকালেই হঠাৎ রহস্যময়ভাবে তাঁহার মৃত্যু হইল। রামকিশোর একাই ব্যবসা চালাইলেন এবং আরও অর্থ অর্জন করিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। রামকিশোর বিবাহ করিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যা

জন্মিল। তারপর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষে রামকিশোর প্রাচীন কালের পৈতৃক সম্পত্তি পুনরায় ক্রয় করিয়া দুর্গের পাশের দ্বিতীয় চূড়ায় নূতন গৃহ নির্মাণ করাইলেন, আশেপাশে বহু জমিদারী কিনিলেন এবং সপরিবারে শৈল-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। দুর্গটিকেও পূর্ব গৌরবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অল্প-বিস্তর মেরামত করানো হইল; কিন্তু তাহা আগের মতই অব্যবহৃত পড়িয়া রহিল।

২

পাথরের পাটি বসানো সাবেক পথটি গিরিচূড়ার পাদমূলে আসিয়া শেষ হয় নাই, কিছুদূর চড়াই উঠিয়াছে। যেখানে চড়াই আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে পথের ধারে একটি বৃহৎ কূপ। কূপের সরসতায় পুষ্ট হইয়া কয়েকটি বড় বড় গাছ তাহার চারিপাশে ব্যূহ রচনা করিয়াছে।

এখান হইতে রাস্তা প্রায় পঞ্চাশ গজ চড়াই উঠিয়া একটি দেউড়ির সম্মুখে শেষ হইয়াছে। তারপর পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি সর্পজিহ্বার মত দুই ভাগ হইয়া দুই দিকে গিয়াছে; একটি গিয়াছে দুর্গের তোরণদ্বার পর্যন্ত, অন্যটি রামকিশোরের বাসভবনে উপনীত হইয়াছে।

দেউড়িতে মোটর রাখিবার একটি লম্বা ঘর এবং চালকের বাসের জন্য ছোট ছোট দুটি কুঠুরি। এখানে রামকিশোরের সাবেক মোটর ও তাহার সাবেক চালক বুলাকিলাল থাকে।

এখান হইতে সিঁড়ির যে ধাপগুলি রামকিশোরের বাড়ির দিকে উঠিয়াছে, সেগুলি একেবারে খাড়া ওঠে নাই, একটু ঘুরিয়া পাহাড়ের অঙ্গ বেড়িয়া উঠিয়াছে। চওড়া সিঁড়িগুলি বাড়ির সদর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

পাহাড়ের মাথার উপর জমি চৌরস করিয়া তাহার মাঝখানে বৃহৎ বাড়ি। বাড়ি ঘিরিয়া ফল-ফুলের বাগান, বাগান ঘিরিয়া ঘন ফণি-মনসার বেড়া। এখানে দাঁড়াইলে পাশেই শত হস্ত দূরে সর্ব্বোচ্চ শিখর ধূম্রবর্ণ দুর্গ দেখা যায়; উত্তরদিকে ছয় মাইল দূরে শহরটি অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। দক্ষিণে চড়াইয়ের মূলদেশ হইতে জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে; যতদূর দৃষ্টি যায় নিবিড় তরুশ্রেণী।

ঐ জঙ্গলটিও রামকিশোরের সম্পত্তি। শাল সেগুন আবলুস কাঠ হইতে বিস্তর আয় হয়।

রামকিশোর যখন প্রথম এই গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স চল্লিশের নীচেই; শরীরও বেশ মজবুত এবং নীরোগ। তথাপি অর্থোপার্জনের জন্য দৌড়াদৌড়ির আর প্রয়োজন নাই বলিয়াই বোধ করি তিনি স্বেচ্ছায় এই অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন তাঁহার স্ত্রী দুইটি পুত্র, একটি কন্যা, বহু চাকর-বাকর এবং প্রবীণ নায়েব চাঁদমোহন দত্ত।

ক্রমে রামকিশোরের আর একটি পুত্র ও কন্যা জন্মিল। তারপর তাঁহার স্ত্রী গত হইলেন! পাঁচটি পুত্র ও কন্যার লালন-পালনের ভার রামকিশোরের উপর পড়িল।

পুত্র-কন্যারা বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। রামকিশোর কিন্তু পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে পারিলেন না। বড় হইয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-কন্যাগুলির স্বভাব প্রকটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই বন্য স্থানে সকল সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার ফলে হয়তো তাহাদের চরিত্র বিকৃত হইয়াছিল। বড় ছেলে বংশীধর দুর্দান্ত ক্রোধী, রাগ হইলে তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে স্থানীয় স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বহরমপুর কলেজে পড়িতে গেল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই সেখানে কি একটা অতি গর্হিত দুষ্কর্ম করার ফলে তাহাকে কলেজ ছাড়িতে হইল। কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহার দুষ্কৃতির স্বরূপ প্রকাশ করিলেন না; কলেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন রামকিশোরের বাল্যবন্ধু, তিনি ব্যাপারটাকে চাপা দিলেন। এমন কি রামকিশোরও প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন না। তিনি জানিতে পারিলে হয়তো অনর্থ ঘটিত।

বংশীধর আবার বাড়িতে আসিয়া বসিল। বাপকে বলিল, সে আর লেখাপড়া করিবে না, এখন হইতে জমিদারী দেখাশুনা করিবে। রামকিশোর বিরক্ত হইয়া বকাবকি করিলেন, কিন্তু ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিলেন না। বংশীধর জমিদারী তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। নায়েব চাঁদমোহন দত্ত হাতে ধরিয়া তাহাকে কাজ শিখাইলেন।

যথাসময়ে রামকিশোর বংশীধরের বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের কয়েক

মাস পরেই বধূর অপঘাত মৃত্যু হইল। বংশীধর গৃহে ছিল না, জমিদারী পরিদর্শনে গিয়াছিল। একদিন সকালে বধূকে গৃহে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দুই চূড়ার মধ্যবর্তী খাঁজের মধ্যে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গেল। বধূ বোধ করি রাত্রে কোনোও কারণে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া খাদের কিনারায় গিয়াছিল, তারপর পা ফস্কাইয়া নীচে পড়িয়াছে। মৃত্যু রহস্যজনক। বংশীধর ফিরিয়া আসিয়া বধূর মৃত্যুর সংবাদে একেবারে ফাটিয়া পড়িল; উন্মত্ত ক্রোধে ভাই বোন কাহাকেও সে দোষারোপ করিতে বিরত হইল না। ইহার পর হইতে তাহার ভীষণ প্রকৃতি যেন ভীষণতর হইয়া উঠিল।

রামকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র মুরলীধর; বংশীধরের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট। গিরগিটির মত রোগা হাড়-বাহির করা চেহারা, ধূর্তামিভরা ছুঁচালো মুখ; চোখ এমন সাংঘাতিক ট্যারা যে, কখন কোন্ দিকে তাকাইয়া আছে বুঝিতে পারা যায় না। তার উপর মেরুদণ্ডের নুব্জতা শীর্ণ দেহটাকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিয়াছে। মুরলীধর জন্মাবধি বিকলাঙ্গ। তাহার চরিত্রও বংশীধরের বিপরীত; সে রাগী নয়, মিটমিটে শয়তান। কিশোর বয়সে দুই ভায়ে একবার ঝগড়া হইয়াছিল, বংশী মুরলীর গালে একটি চড় মারিয়াছিল। মুরলীর গায়ে জোর নাই। সে তখন চড় হজম করিয়াছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে বংশী হঠাৎ এমন ভেদবমি আরম্ভ করিল যে যায়-যায় অবস্থা। এ ব্যাপারে মুরলীর যে কোনোও হাত আছে তাহা ধরা গেল না; কিন্তু তদবধি বংশী আর কোনোও দিন তাহার গায়ে হাত তুলিতে সাহস করে নাই। তর্জন গর্জন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে।

মুরলীধর লেখাপড়া শেখে নাই, তার উপর ওই চেহারা; বাপ তাহার বিবাহ দিলেন না। সে আপন মনে থাকে এবং দিবারাত্র পান-সুপারি চিবায়। তাহার একটি খাস চাকর আছে, নাম গণপৎ। গণপৎ মুরলীধরেরই সমবয়স্ক; বেঁটে নিরেট চেহারা, গোল মুখ, চক্ষু দুটিও গোল, ভ্রূযুগল অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয় সে সর্বদাই শিশুসুলভ বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া আছে। অথচ তাহার মত দুষ্ট খুব কম দেখা যায়। এমন দুষ্কর্ম নাই যাহা গণপতের অসাধ্য; নারীহরণ হইতে গৃহদাহ পর্যন্ত, প্রভুর

আদেশ পাইলে সে সব কিছুই করিতে পারে। প্রভুভৃত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শোনা যায়, ইহারা দুইজনে মিলিয়া অনেক দুষ্কৃতি করিয়াছে, কিন্তু কখনও ধরা পরে নাই।

রামকিশোরের তৃতীয় সন্তানটি কন্যা, নাম হরিপ্রিয়া। সে মুরলীধর অপেক্ষা বছর চারেকের ছোট; দেখিতে শুনিতে ভালই, কোনোও শারীরিক বিকলতা নাই। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টি যেন বিষমাখানো। মনও ঈর্ষার বিষে ভরা। হরিপ্রিয়া নিজের ভাই-বোনদের দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। সকলের ছিদ্রান্বেষণ, পান হইতে চূণ খসিলে তীব্র অসন্তোষ এবং তদুপযোগী বচন-বিন্যাস, এই ছিল হরিপ্রিয়ার স্বভাব। বংশীধরের বিবাহের পর যখন নববধূ ঘরে আসিল, তখন হরিপ্রিয়ার ঈর্ষার জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। বধূটি ভাল মানুষ ও ভীরু স্বভাব; হরিপ্রিয়া পদে পদে তাহার খুঁৎ ধরিয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়া বাক্যবাণে জর্জর করিয়া তুলিল।

তারপর অকস্মাৎ বধূর মৃত্যু হইল। এই দুর্যোগ কাটিয়া যাইবার কয়েক মাস পরে রামকিশোর কন্যার বিবাহ দিলেন। হরিপ্রিয়া শ্বশুর-ঘর করিতে পারিবে না বুঝিয়া তিনি দেখিয়া শুনিয়া একটি গরীব ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন। ছেলেটির নাম মণিলাল; লেখাপড়ায় ভাল, বি, এস-সি, পাশ করিয়াছে; স্বাস্থ্যবান, শান্ত প্রকৃতি, বিবাহের পর মণিলাল শ্বশুরগৃহে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল।

হরিপ্রিয়া ও মণিলালের দাম্পত্য জীবন সুখের হইল কিনা বাহির হইতে বোঝা গেল না। মণিলাল একেই চাপা প্রকৃতির যুবক, তার উপর দরিদ্র ঘরজামাই; অ-সুখের কারণ ঘটিলেও সে নীরব রহিল। হরিপ্রিয়াও নিজের স্বামীকে অন্যের কাছে লঘু করিল না। বরং তাহার ভ্রাতারা মণিলালকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করিলে সে ফোঁস করিয়া উঠিত।

একটি বিষয়ে নবদম্পতির মধ্যে প্রকাশ্য ঐক্য ছিল। মণিলাল বিবাহের পর শ্বশুরের বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্যালকদের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, কাহারও প্রতি অনুরাগ বিরাগ ছিল না; কিন্তু শ্বশুরের প্রতি যে তাহার অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে তাহা তাহার প্রতি বাক্যে ও আচরণে প্রকাশ পাইত। হরিপ্রিয়াও পিতাকে ভালবাসিত; পিতাকে

ছাড়া আর কাহাকেও বোধ হয় সে অন্তরের সহিত ভালবাসিত না। ভালবাসিবার শক্তি হরিপ্রিয়ার খুব বেশী ছিল না।

হরিপ্রিয়ার পর পর দু'টি ভাই বোন; কিশোর বয়স্ক গদাধর এবং সর্বকনিষ্ঠা তুলসী। গদাধর একটু হাবলা গোছের, বয়সের অনুযায়ী বুদ্ধি পরিণত হয় নাই। কাছা কোঁচার ঠিক থাকে না, অকারণে হি হি করিয়া হাসে। লেখাপড়ায় তাহারও মন নাই; গুলতি লইয়া বনে পাখি শিকার করিয়া বেড়ানো তাহার একমাত্র কাজ।

এই কাজে ছোট বোন তুলসী তাহার নিত্য সঙ্গিনী। তুলসীর বুদ্ধি কিন্তু গদাধরের মত নয়, বরং বয়সের অনুপাতে একটু বেশী। ছিপছিপে শরীর, সুশ্রী পাৎলা মুখ, অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতি। দুপুরবেলা জঙ্গলের মধ্যে পাখির বাসা বা খরগোশের গর্ত খুঁজিয়া বেড়ানো এবং সকল বিষয়ে গদাধরের অভিভাবকতা করা তাহার কাজ। বাড়িতে কে কোথায় কি করিতেছে কিছুই তুলসীর চক্ষু এড়ায় না। সে কখন কোথায় থাকে তাহাও নির্ণয় করা কাহারও সাধ্য নয়। তবু সব ভাইবোনের মধ্যে তুলসীকেই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রকৃতিস্থ বলা চলে।

রামকিশোরের সংসারের পুত্রকন্যা ছাড়া আর একটি পোষ্য ছিল যাহার পরিচয় আবশ্যক। ছেলেটির নাম রমাপতি। দুঃস্থ স্বজাতি দেখিয়া রামকিশোর তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। রমাপতি ম্যাট্রিক পাস; সে গদাধর ও তুলসীকে পড়াইবে এই উদ্দেশ্যেই রামকিশোর তাহাকে গৃহে রাখিয়াছিলেন। রমাপতির চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু ছাত্রছাত্রীর সহিত মাস্টারের সাক্ষাৎকার বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না। রমাপতি মুখচোরা ও লাজুক স্বভাবের ছেলে, ছাত্র-ছাত্রী তাহাকে অগ্রাহ্য করিত; বাড়ির অন্য সকলে তাহার অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব লক্ষ্যই করিত না। এমনিভাবে দু'বেলা দু'মুঠি অন্ন ও আশ্রয়ের জন্য রমাপতি বাড়ির এক কোণে পড়িয়া থাকিত।

নায়েব চাঁদমোহন দত্তের উল্লেখ পূর্বেই হইয়াছে। তিনি রামকিশোর অপেক্ষা পাঁচ-ছয় বছরের বড়; রামকিশোরের কর্মজীবনের আরম্ভ হইতে তাঁহার সঙ্গে আছেন। বংশীধর জমিদারী পরিচালনার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার পর তাঁহার একপ্রকার ছুটি হইয়াছিল। কিন্তু তবু তিনি

কাজকর্মের দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখিতেন; আয় ব্যয় হিসাব নিকাশ সমস্তই তাঁহার অনুমোদনের অপেক্ষা রাখিত। লোকটি অতিশয় হুঁসিয়ার ও বিষয়জ্ঞ; দীর্ঘকাল একত্র থাকিয়া বাড়ির একজন হইয়া গিয়াছিলেন।

রামকিশোর পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু স্নেহের বশে এবং বয়োধর্মে মানুষের সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। যৌবনকালে তাঁহার প্রকৃতি দুর্জয় ও অসহিষ্ণু ছিল, এখন অনেকটা নরম হইয়াছে। পূর্বে পুরুষকারকেই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতেন, এখন অদৃষ্টকে একেবারে অস্বীকার করেন না। ধর্মকর্মের প্রতি অধিক আসক্তি না থাকিলেও ঠাকুরদেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব বংশের মেয়ে, হয়তো তাঁহার প্রভাব রামকিশোরের জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। অন্তত পুত্র-কন্যাদের নামকরণের মধ্যে সে প্রভাবের ছাপ রহিয়া গিয়াছে।

তবু, কদাচিৎ কোনোও কারণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলে তাঁহার প্রচণ্ড অন্তঃপ্রকৃতি বাহির হইয়া আসিত, কলসীর মধ্যে আবদ্ধ দৈত্যের মত কঠিন হিংস্র ক্রোধ প্রকাশ হইয়া উঠিত। তখন তাঁহার সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিত না, এমন কি বংশীধর পর্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া যাইত। তাঁহার ক্রোধ কিন্তু বেশী-ক্ষণ স্থায়ী হইত না, দপ করিয়া জ্বলিয়া আবার দপ করিয়া নিভিয়া যাইত।

৩

হরিপ্রিয়ার বিবাহের আট নয় মাস পরে শীতের শেষে একদল বেদে-বেদেনী আসিয়া কূয়ার সন্নিকটে আস্তানা গাড়িল। তাহাদের সঙ্গে একপাল গাধা কুকুর মুরগী সাপ প্রভৃতি জন্তুজানোয়ার। তাহারা রাত্রে ধুনি জ্বালিয়া মদ্যপান করিয়া মেয়ে-মদ্দ নাচগান হুল্লোড় করে, দিনের বেলা জঙ্গলে কাঠ কাটে, ফাঁদ পাতিয়া বনমোরগ খরগোশ ধরে, কূপের জল যথেচ্ছা ব্যবহার করে। বেদে জাতির নীতিজ্ঞান কোনোও কালেই খুব প্রখর নয়।

রামকিশোর প্রথমটা কিছু বলেন নাই, কিন্তু ক্রমে উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, গদাধর ও তুলসী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বেদের তাঁবুগুলির আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অনেক

শাসন করিয়াও তাহাদের বিনিদ্র কৌতূহল দমন করা গেল না। বাড়ির বয়স্থ লোকের অবশ্য প্রকাশ্যে বেদেপল্লীকে পরিহার করিয়া চলিল; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে বাড়ির চাকর-বাকর এবং মালিকদের মধ্যে কেহ কেহ যে সেখানে পদার্পণ করিত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বেদেনী যুবতীদের রূপ যত না থাক মোহিনী শক্তি আছে।

হপ্তাখানেক এইভাবে কাটিবার পর একদিন কয়েকজন বেদে-বেদেনী একেবারে রামকিশোরের সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শিলাজিৎ, কস্তুরী মৃগের নাভি, সাপের বিষ, গন্ধকমিশ্র সাবান প্রভৃতির পসরা খুলিয়া বসিল। বংশীধর উপস্থিত ছিল, সে মার-মার করিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিল রামকিশোর হুকুম দিলেন, আজই যেন তাহারা এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

বেদেরা এই আদেশ পালন করিল বটে, কিন্তু পুরাপুরি নয়। সন্ধ্যার সময় তাহারা ডেরাডাণ্ডা তুলিয়া দুই তিন শত গজ দূরে জঙ্গলের কিনারায় গিয়া আবার আস্তানা গাড়িল। পরদিন সকালে বংশীধর তাহা দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। বন্দুক লইয়া সে তাঁবুতে উপস্থিত হইল, সঙ্গে কয়েকজন চাকর। বংশীধরের হুকুম পাইয়া চাকরেরা বেদেদের পিটাইতে আরম্ভ করিল, বংশীধর বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিল। এবার বেদেরা সত্যই এলাকা ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

আপদ দূর হইল বটে, কিন্তু নায়েব চাঁদমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'কাজটা বোধহয় ভাল হল না। ব্যাটারা ভারি শয়তান, হয়তো অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে।'

বংশীধর উদ্ধতভাবে বলিল, 'কি অনিষ্ট করতে পারে ওরা?'

চাঁদমোহন বলিলেন, 'তা কি বলা যায়। হয়তো কুয়োয় বিষ ফেলে দিয়ে যাবে, নয়তো জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেবে—'

কিছুদিন সকলে সর্তক রহিলেন, কিন্তু কোনোও বিপদাপদ ঘটিল না। বেদেরা কোনোও প্রকার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই, কিম্বা করিলেও তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই।

মাসখানেক পরে রামকিশোর পরিবারবর্গকে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে বন-ভোজনে গেলেন। ইহা তাঁহার একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান। বনের মধ্যে

চাঁদোয়া টাঙানো হয়; ভৃত্যেরা পাঁঠা কাটিয়া রন্ধন করে; ছেলেরা বন্দুক লইয়া জঙ্গলের মধ্যে পশুপক্ষীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কর্তা চাঁদোয়ার তলে বসিয়া চাঁদমোহনের সঙ্গে দু'চার বাজি দাবা খেলেন। তারপর অপরাহ্নে সকলে গৃহে ফিরিয়া আসেন।

সকালবেলা দলবল লইয়া রামকিশোর উদ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঘন শালবনের মধ্যে একটি স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে; মাটির উপর শতরঞ্চি পাতা, মাথার উপর চন্দ্রাতপ। পাচক উনান জ্বালিতেছে, চাকর-বাকর রান্নার উদ্যোগ করিতেছে। মোটর চালক বুলাকিলাল একরাশ সিদ্ধির পাতা লইয়া হামান্‌দিস্তায় কুটিতে বসিয়াছে, বৈকালে ভাঙের সরবৎ হইবে। আকাশ স্বর্ণাভ রৌদ্র, শালবনের ছায়ায় স্নিগ্ধ হইয়া বাতাস মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও কোনও দুর্লক্ষণের চিহ্নমাত্র নাই।

দুই বৃদ্ধ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া দাবার ছক্ পাতিলেন; আর সকলে বনের মধ্যে এদিক ওদিক অদৃশ্য হইয়া গেল। বংশীধর বন্দুক কাঁধে ফেলিয়া এক দিকে গেল, মুরলীধর নিত্যসঙ্গী গণপৎকে লইয়া অন্য দিকে শিকার সন্ধানে গেল। দু'জনেই ভাল বন্দুক চালাইতে পারে। গদাধর ও তুলসী একসঙ্গে বাহির হইল; মাস্টার রমাপতি দূরে দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। কারণ ঘন জঙ্গলের মধ্যে বালকবালিকার পথ হারানো অসম্ভব নয়। রামকিশোর বলিয়া দিয়াছিলেন, 'ওদের চোখে চোখে রেখো।'

জামাই মণিলাল একখানা বই লইয়া আস্তানা হইতে কিছু দূরে একটা গাছের আড়ালে গিয়া বসিল। রামকিশোর তাহাকে তন্ত্র সম্বন্ধে একটি ইংরেজি বই দিয়াছিলেন তাহাই সে মনোযোগের সহিত দাগ দিয়া পড়িতেছিল। তাহার শিকারের শখ নাই।

বাকি রহিল কেবল হরিপ্রিয়া। সে কিছুক্ষণ রান্নার আয়োজনের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইল, একবার স্বামীর গাছতলার দিকে গেল, তারপর একাকিনী বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। আজ একদিনের জন্য সকলে স্বাধীন হইয়াছে; একই বাড়িতে এতগুলো লোক একসঙ্গে থাকিয়া যেন পরস্পরের সান্নিধ্যে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তাই বনের মধ্যে ছাড়া পাইয়া একটু নিঃসঙ্গতা উপভোগ করিয়া লইতেছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। দুই বৃদ্ধ খেলায় মগ্ন হইয়া গিয়াছেন, জঙ্গলের অভ্যন্তর হইতে থাকিয়া থাকিয়া বন্দুকের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, রন্ধনের সুগন্ধ বাতাস আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে গিরিচূড়ায় চূণকাম করা বাড়ি এবং ভাঙা দুর্গ দেখা যাইতেছে। বেশী দূর নয়, বড় জোর আধ মাইল। ভাঙা দুর্গের ছায়া মাঝের খাদ লঙ্ঘন করিয়া সাদা বাড়ির উপর পড়িয়াছে।

হঠাৎ একটা তীব্র একটানা চীৎকার অলস বনমর্মরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। দাবা খেলোয়াড় দুইজন চমকিয়া চোখ তুলিলেন। গাছের তলায় মণিলাল বই ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল, তুলসী শালবনের আলোছায়ার ভিতর দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে এবং তারস্বরে চীৎকার করিতেছে।

তুলসী চাঁদোয়া পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই মণিলাল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, তাহার কাঁধে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া বলিল, 'এই তুলসী! কি হয়েছে! চেঁচাচ্ছিস কেন?'

তুলসী পাগলের মত ঘোলাটে চোখ তুলিয়া ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, তারপর আগের মতই চীৎকার করিয়া বলিল,—'দিদি! গাছ তলায় পড়ে আছে—বোধহয় মরে গেছে! শিগ্‌গির এসো—বাবা, জেঠামশাই, শিগ্‌গির এসো।'

তুলসী যেদিক হইতে আসিয়াছিল আবার সেই দিকে ছুটিয়া চলিল; মণিলালও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। দুই বৃদ্ধ আলুথালুভাবে তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

প্রায় দুইশত গজ দূরে ঘন গাছের ঝোপ; তুলসী ঝোপের কাছে আসিয়া একটা গাছের নীচে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। হরিপ্রিয়া বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিল, দেখা গেল সে ছায়াঘন গাছের তলায় পড়িয়া আছে, আর, কে একটা লোক তাহার শরীরের উপর ঝুঁকিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে।

পদশব্দ শুনিয়া রমাপতি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ ভয়ে শীর্ণ, সে স্খলিত স্বরে বলিল, 'সাপ! সাপে কামড়েছে।'

মণিলাল তাহাকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিল, তারপর দুই বাহু দ্বারা

হরিপ্রিয়াকে তুলিয়া লইল। হরিপ্রিয়ার তখন জ্ঞান নাই। বাঁ পায়ের গোড়ালির উপর সাপের দাঁতের দাগ; পাশাপাশি দুটি রক্তবর্ণ চিহ্ন।

৪

হরিপ্রিয়া বাঁচিল না, বাড়িতে লইয়া যাইতে যাইতে পথেই তাহার মৃত্যু হইল।

জঙ্গলে ইতিপূর্বে কেহ বিষধর সাপ দেখে নাই। এবারও সাপ চোখে দেখা গেল না বটে, কিন্তু সাপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। এবং ইহা যে বেদেদের কাজ, তাহারাই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে জঙ্গলে সাপ কিম্বা সাপের ডিম ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে, তাহাও একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু বেদের দল তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সন্ধান পাওয়া গেল না।

হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর পর কিছুদিন রামকিশোরের বাড়ির উপর অভিশাপের মত একটা থমথমে ছায়া চাপিয়া রহিল। রামকিশোর তাঁহার সকল সন্তানদের মধ্যে হরিপ্রিয়াকেই বোধহয় সবচেয়ে বেশী ভালবাসিতেন; তিনি দারুণ আঘাত পাইলেন। মণিলাল অতিশয় সম্বৃতচরিত্র যুবক, কিন্তু সেও এই আকস্মিক বিপর্যয়ে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা হইয়া গেল। অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পে তাহার নবগঠিত জীবনের ভিত্তি একেবারে ধ্বসিয়া গিয়াছিল।

আর একজন এই অনর্থপাতে গুরুতর ভাবে অভিভূত হইয়াছিল, সে তুলসী। তুলসী যে তাহার দিদিকে খুব বেশী ভালবাসিত তা নয়, বরং দুই বোনের মধ্যে খিটিমিটি লাগিয়াই থাকিত। হরিপ্রিয়া সুযোগ পাইলেই তুলসীকে শাসন করিত, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিত। তবু, হরিপ্রিয়ার মৃত্যু চোখের সামনে দেখিয়া তুলসী কেমন যেন বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন বনের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সে অদূরে গাছতলায় হলুদবর্ণ শাড়ি দেখিয়া সেই দিকে গিয়াছিল; তারপর দিদিকে ঐভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ভীতভাবে ডাকাডাকি করিয়াছিল। হরিপ্রিয়া কেবল একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল, কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—

সেই হইতে তুলসীর ধন্দ লাগিয়া গিয়াছিল। ভূতগ্রস্তের মত শঙ্কিত চক্ষু মেলিয়া সে বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইত; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিত। তাহার অপসারিত স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যে কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বংশীধর এবং মুরলীধরও ধাক্কা পাইয়াছিল কিন্তু এতটা নয়। বংশীধর গুম হইয়া গিয়াছিল; মনে মনে সে হয়তো হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দোষী করিতেছিল, বেদেদের উপর অতটা জুলুম না করিলে বোধ হয় এ ব্যাপার ঘটিত না। মুরলীধরের বাহ্য চালচলনে কোনোও পরিবর্তন দেখা যায় নাই বটে কিন্তু সেও কচ্ছপের মত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইয়াছিল। দুই ভ্রাতার মধ্যে কেবল একটি বিষয়ে ঐক্য হইয়াছিল, দুই-জনেই মণিলালকে বিষচক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যেন হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর জন্য মণিলালই দায়ী।

হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর একমাস পরে মণিলাল রামকিশোরের কাছে গিয়া বিদায় চাহিল। এ সংসারের সহিত তাহার সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে, এই কথার উল্লেখ করিয়া সে সজল চক্ষে বলিল, 'আপনার স্নেহ কখনও ভুলব না। কিন্তু এ পরিবারে আর তো আমার স্থান নেই।'

রামকিশোরের চক্ষুও সজল হইল। তিনি বলিলেন, 'কেন স্থান নেই? যে গেছে সে তো গেছেই, আবার তোমাকেও হারাবো? তা হবে না। তুমি থাকো। যদি ভগবান করেন আবার হয়তো সম্পর্ক হবে।'

বংশীধর ও মুরলীধর উপস্থিত ছিল। বংশীধর মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল; মুরলীধরের ঠোঁট অসন্তোষে বাঁকা হইয়া উঠিল। ইঙ্গিতটা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না।

মণিলাল রহিয়া গেল। পূর্বাপেক্ষাও নিস্পৃহ এবং নির্লিপ্তভাবে ভূতপূর্ব শ্বশুর-গৃহে বাস করিতে লাগিল।

অতঃপর বছর দুই নিরুপদ্রবে কাটিয়া গিয়াছে। রামকিশোরের সংসার আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কেবল তুলসী পূর্বের মত ঠিক প্রকৃতিস্থ হইল না। তাহার মনে এমন গুরুতর ধাক্কা লাগিয়াছিল, যাহার ফলে তাহার দৈনিক ও মানসিক বৃদ্ধি নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

দশ বছর বয়সে তাহার দেহ-মন যেরূপ অপরিণত ছিল, তের বছরে পা দিয়াও তেমনি অপরিণত আছে। মোট কথা, যৌবনোদ্‌গমের স্বাভাবিক বয়সে উপনীত হইয়াও সে বালিকাই রহিয়া গিয়াছে।

উপরন্তু তাহার মনে আর একটি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে মাষ্টারের প্রতি পূর্বে তাহার অবহেলার অন্ত ছিল না, অহেতুকভাবে সে সেই মাষ্টারের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে মাষ্টার রমাপতি যতটা আনন্দিত হইয়াছে তাহার অধিক সঙ্কোচ ও অশান্তি অনুভব করিতেছে। কারণ অবহেলায় যাহারা অভ্যস্ত, একটু সমাদর পাইলে তাহারা বিব্রত হইয়া ওঠে।

যাহোক, রামকিশোরের সংসার-যন্ত্র আবার সচল হইয়াছে এমন সময় বাড়িতে একজন অতিথি আসিলেন। ইনি রামকিশোরের যৌবনকালের বন্ধু। আসলে রামকিশোরের দাদা রামবিনোদের সহিত ইহার গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। রামবিনোদের অকালমৃত্যুর পর রামকিশোরের সহিত তাঁহার সখ্য-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রীতির সূত্র একেবারে ছিন্ন হয় নাই। ইনি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন। নাম ঈশানচন্দ্র মজুমদার। কয়েক বছর আগে বংশীধর যখন কলেজে দুষ্কৃতি করার ফলে বিতাড়িত হইতেছিল, তখন ইনিই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ঈশানচন্দ্রের চেহারা তপঃকৃশ সন্ন্যাসীর ন্যায় শুষ্কশীর্ণ, প্রকৃতি ঈষৎ তিক্তরসাক্ত। অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়াছিল, অর্থেরও বোধকরি অনটন ঘটিয়াছিল। তিনি পূর্ব ঘনিষ্ঠতা স্মরণ করিয়া রামকিশোরকে পত্র লিখিলেন; তোমাদের অনেকদিন দেখি নাই, কবে আছি কবে নাই, ওখানকার জলহাওয়া নাকি ভাল, ইত্যাদি। রামকিশোর উত্তরে অধ্যাপক মহাশয়কে সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়া পত্র লিখিলেন, এখানকার স্বাস্থ্য খুবই ভাল, তুমি এস, দু'এক মাস থাকিলেই শরীর সারিয়া যাইবে।

যথাসময়ে ঈশানচন্দ্র আসিলেন এবং বাড়িতে অধিষ্ঠিত হইলেন। বংশীধর কিছু জানিত না, সে খাস-আবাদী ধান কাটাইতে গিয়াছিল; বাড়ি ফিরিয়া ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে তাহার মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। বংশীধর ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিল; তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়া আবার ধীরে

ধীরে লাল হইয়া উঠিল। সে ঈশানচন্দ্রের কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল, 'আপনি এখানে?'

ঈশানচন্দ্র কিছুক্ষণ একদৃষ্টে প্রাক্তন শিষ্যের পানে চাহিয়া থাকিয়া শুষ্কস্বরে বলিলেন, 'এসেছি। তোমার আপত্তি আছে নাকি?'

বংশীধর তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'শুনে যান। একটা কথা আছে।'

আড়ালে গিয়া গুরুশিষ্যের মধ্যে কি কথা হইল তাহা কেহ জানিল না। কিন্তু বাক্যবিনিময় যে আনন্দদায়ক হয় নাই তাহা প্রমাণ হইল যখন ঈশানচন্দ্র রামকিশোরকে গিয়া বলিলেন যে, তিনি আজই চলিয়া যাইতে চান। রামকিশোর তাঁহার অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন; শেষ পর্যন্ত রফা হইল অধ্যাপক মহাশয় দুর্গে গিয়া থাকিবেন। দুর্গের দু'একটি ঘর বাসোপযোগী আছে; অধ্যাপক মহাশয়ের নির্জনবাসে আপত্তি নাই। তাঁহার খাদ্য দুর্গে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

সেদিন সন্ধ্যায় ঈশানচন্দ্রকে দুর্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামকিশোর ফিরিয়া আসিলেন এবং বংশীধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পিতাপুত্রে সওয়াল জবাব চলিল। হঠাৎ রামকিশোর খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন এবং উগ্রকণ্ঠে পুত্রকে ভর্ৎসনা করিলেন। বংশীধর কিন্তু চেঁচামেচি করিল না, আরক্ত চক্ষে নিস্ফল ক্রোধ ভরিয়া তিরস্কার শুনিল।

যাহোক ঈশানচন্দ্র দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। রাত্রে তিনি একাকী থাকেন কিন্তু দিনের বেলা বংশীধর ও মুরলীধর ছাড়া বাড়ির আর সকলেই দুর্গে যাতায়াত করে। মুরলীধর অধ্যাপক মহাশয়ের উপর মর্মান্তিক চটিয়াছিল, কারণ তিনি দুর্গ অধিকার করিয়া তাহার গোপন কেলিকুঞ্জটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

অতঃপর এক পক্ষ নির্ঝঞ্জাটে কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় রামকিশোর ঈশানচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন, দেউড়ি পর্যন্ত নামিয়া দুর্গের সিঁড়ি ধরিবেন, দেখিতে পাইলেন কুয়ার কাছে তরুগুচ্ছের ভিতর হইতে ধুঁয়া বাহির হইতেছে। কৌতূহলী হইয়া তিনি সেইদিকে গেলেন। দেখিলেন, বৃক্ষতলে এক সাধু ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া আছেন।

পূর্ববৎ আছেন। কেবল মালতী দেবী আর ইহলোকে নাই ; প্রোফেসর সোম বাড়ি বিক্রী করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর কাজের কথা আরম্ভ হইল। পুরন্দর পাণ্ডে অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুর হাল বয়ান করিলেন। সেই সঙ্গে রামকিশোরের পারিবারিক সংস্থাও অনেকখানি জানা গেল।

অধ্যাপক মজুমদারের মৃত্যুর বিবরণ এইরূপ ঃ—তিনি মাসখানেক দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, শরীর বেশ সারিয়াছিল। কয়েকদিন আগে তিনি রাত্রির আহার সম্পন্ন করিয়া অভ্যাসমত দুর্গের প্রাঙ্গণে পায়চারি করিলেন ; সে সময় মাষ্টার রমাপতি তাঁহার সঙ্গে ছিল। আন্দাজ সাড়ে নয়টার সময় রমাপতি বাড়িতে ফিরিয়া গেল ; অধ্যাপক মহাশয় একাকী রহিলেন। তারপর রাত্রিকালে দুর্গে কি ঘটিল কেহ জানে না। পরদিন প্রাতঃকালেই রমাপতি আবার দুর্গে গেল। গিয়া দেখিল, অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার শয়নঘরের দ্বারের কাছে মরিয়া পড়িয়া আছেন। তাহার পায়ের গোড়ালিতে সর্পাঘাতের চিহ্ন, মাথার পিছন দিকে ঘাড়ের কাছে একটা কালশিরার দাগ এবং ডান হাতের মুঠির মধ্যে একটি বাদশাহী আমলের চক্‌চকে মোহর।

সর্পাঘাতের চিহ্ন প্রথমে কাহারও চোখে পড়ে নাই। রামকিশোর সন্দেহ করিলেন, রাত্রে কোনও দুর্বৃত্ত আসিয়া ঈশানবাবুকে মারিয়া গিয়াছে ; মস্তকের আঘাত-চিহ্ন এই অনুমান সমর্থন করিল। তিনি পুলিসে খবর পাঠাইলেন।

কিন্তু পুলিস আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই সর্প-দংশনের দাগ আবিষ্কৃত হইল। তখন আর উপায় নাই। পুলিস আসিয়া শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য লাস চালান দিল।

শব-ব্যবচ্ছেদের ফলে মৃতের রক্তে সাপের বিষ পাওয়া গিয়াছে, গোখুরা সাপের বিষ। সুতরাং সর্পাঘাতই যে মৃত্যুর কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু পুরন্দর পাণ্ডে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ইহার মধ্যে একটা কারচুপি আছে।

সব শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সাপের বিষে মৃত্যু হয়েছে একথা যখন অস্বীকার করা যায় না, তখন সন্দেহ কিসের?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সন্দেহের অনেকগুলো ছোট কারণ আছে। কোনোটাই স্বতন্ত্রভাবে খুব জোরালো নয় বটে, কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে একটা কিছু পাওয়া যায়। প্রথমত দেখুন, ঈশানবাবু মারা গেছেন সর্পাঘাতে। তবে তাঁর মাথায় চোট লাগল কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এমন হতে পারে, সাপে কামড়াবার পর তিনি ভয় পেয়ে পড়ে যান, মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারপর অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সম্ভব নয় কি?'

'অসম্ভব নয়। কিন্তু আরও কথা আছে। সাপ এল কোত্থেকে? আমি তন্নতন্ন ক'রে খোঁজ করিয়েছি, কোথাও বিষাক্ত সাপের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু আপনি যে বললেন দু'বছর আগে রামকিশোরবাবুর মেয়েও সর্পাঘাতে মারা গিয়েছিল।'

'তাকে সাপে কামড়েছিল জঙ্গলে। সেখানে সাপ থাকতেও পারে। কিন্তু দুর্গে সাপ উঠল কি করে? পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা অসম্ভব। সিঁড়ি বেয়ে উঠতেও পারে, কিন্তু ওঠবার কোনও কারণ নেই। দুর্গে ইঁদুর, ব্যাং কিচ্ছু নেই, তবে কিসের লোভে সাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠবে?'

'তাহলে—?'

'তবে যদি কেউ সাপ নিয়ে গিয়ে দুর্গে ছেড়ে দিয়ে থাকে, তাহলে হ'তে পারে।'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'হুঁ, আর কিছু?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আর, ভেবে দেখুন, অধ্যাপক মহাশয়ের মুঠির মধ্যে একটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সেটি এল কোত্থেকে?'

'হয়তো তাঁর নিজের জিনিস।'

'অধ্যাপক মহাশয়ের আর্থিক অবস্থার যে পরিচয় সংগ্রহ করেছি, তাতে তিনি মোহর হাতে নিয়ে সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন বলে মনে হয় না।'

'তবে—কি অনুমান করেন?'

'কিছুই অনুমান করতে পারছি না; তাতেই তো সন্দেহ আরও বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এটা মামুলি সর্পাঘাত নয়, এর মধ্যে রহস্য আছে।'

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবুর আত্মীয় পরিজন কেউ নেই?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'এক বিবাহিতা মেয়ে আছে। জামাই নেপালে ডাক্তারি করে। খবর পেলাম, মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে অধ্যাপক মহাশয়ের সদ্ভাব ছিল না।'

ব্যোমকেশ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট কাটিবার পর পাণ্ডে আবার কহিলেন, 'যেসব কথা শুনলেন সেগুলোকে ঠিক প্রমাণ বলা চলে না তা মানি, কিন্তু অবহেলা করাও যায় না। তা ছাড়া, আর একটা কথা আছে। রামকিশোরবাবুর বংশটা ভাল নয়।'

ব্যোমকেশ চকিত হইয়া বলিল, 'সে কি রকম?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বংশের একটা মানুষও সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়। রামকিশোরবাবুকে আপাতদৃষ্টিতে ভালমানুষ ব'লে মনে হয়, কিন্তু সেটা পোষ-মানা বাঘের নিরীহতা; সহজাত নয়, মেকি। তাঁর অতীত জীবনে বোধ হয় কোনও গুপ্তরহস্য আছে, নৈলে যৌবন পার না হতেই তিনি এই জঙ্গলে অজ্ঞাতবাস শুরু করলেন কেন তা বোঝা যায় না। তারপর, বড় ছেলে বংশীধর একটি আস্ত কাঠগোঁয়ার; সে যেভাবে জমিদারী শাসন করে, তাতে মনে হয় সে চেঙ্গিস্ খাঁর ভায়রাভাই। শুনেছি জমিদারীতে দু'একটা খুন জখমও করেছে, কিন্তু সাক্ষী-সাবুদ নেই—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বয়স কত বংশীধরের? বিয়ে হয়েছে?'

'বয়স ছাব্বিশ সাতাশ। বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই বৌয়ের অপঘাত মৃত্যু হয়। দেখা যাচ্ছে, এ বংশে মাঝে মাঝে অপঘাত মৃত্যু লেগেই আছে।'

'এরও কি সর্পাঘাত?'

'না। দুপুর রাত্রে ওপর থেকে খাদে লাফিয়ে পড়েছিল কিম্বা কেউ ফেলে দিয়েছিল।'

'চমৎকার বংশটি তো! তারপর বলুন।'

'মেজ ছেলে মুরলীধর আর একটি গুণধর। ট্যারা এবং কুঁজো; বাপ বিয়ে দেননি। বাপকে লুকিয়ে লোচ্চামি করে। একটা মজা দেখেছি,

দুই ছেলেই বাপকে যমের মতন ভয় করে। বাপ যদি গো-বেচারি ভালমানুষ হতেন, তাহলে ছেলেরা তাঁকে অত বেশী ভয় করত না।'

'হুঁ—তারপর?'

'মুরলীধরের পরে এক মেয়ে ছিল, হরিপ্রিয়া। সে সর্পাঘাতে মারা গেছে। তার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ জানি না। তবে জামাইটি সহজ মানুষ।

'জামাই!'

পাণ্ডে জামাই মণিলালের কথা বলিলেন। তারপর গদাধর ও তুলসীর পরিচয় দিয়া বিবরণ শেষ করিলেন, 'গদাধরটা হ্যালা-ক্যাবলা; তার যেটুকু বুদ্ধি সেটুকু দুষ্টু-বুদ্ধি। আর তুলসী—তুলসী মেয়েটা যে কী তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। নির্বোধ নয়, হ্যাকা-বোকা নয়, ইঁচড়ে পাকাও নয়; তবু যেন কেমন একরকম।'

ব্যোমকেশ ধীরে-সুস্থে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া বলিল; 'আপনি যে-ভাবে চরিত্রগুলিকে সমীক্ষণ করেছেন, তাতে মনে হয় আপনার বিশ্বাস এদের মধ্যে কেউ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ঈশানবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

পাণ্ডে একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আমার সন্দেহ তাই, কিন্তু সন্দেহটা এখনও বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছয়নি। বৃদ্ধ অধ্যাপককে মেরে কার কি ইষ্টসিদ্ধি হল সেটা বুঝতে পারছি না। যাহোক, আপনার মন্তব্য এখন মুলতুবী থাক। আজ বিকেলবেলা দুর্গে যাওয়া যাবে; সেখানে সরেজমিন তজবিজ করে আপনার যা মনে হয় বলবেন।'

পাণ্ডে আফিসের কাজ দেখিতে চলিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি মনে হল?'

বলিলাম, 'সবই যেন ধোঁয়া ধোঁয়া।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ধোঁয়া যখন দেখা যাচ্ছে, তখন আগুন আছে। শাস্ত্রে বলে, পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ।'

সাধুর অঙ্গ বিভূতিভূষিত, মাথায় জটা, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। রামকিশোর এবং সাধুবাবা অনেকক্ষণ স্থির নেত্রে পরস্পর নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর সাধুবাবার কণ্ঠ হইতে খল্ খল্ হাস্য নির্গত হইল।

রামকিশোরের দুর্গে যাওয়া হল না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার তাড়স দিয়া জ্বর আসিল। জ্বরের ঘোরে তিনি প্রলাপ বকিতে লাগিলেন।

ডাক্তার আসিল। প্রলাপ বন্ধ হইল, জ্বরও ছাড়িল। রামকিশোর ক্রমে সুস্থ হইলেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁহার হৃদয়যন্ত্র গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। পূর্বে তাহার হৃদযন্ত্র বেশ মজবুত ছিল।

আরও একপক্ষ কাটিল। ঈশানচন্দ্র পূর্ববৎ দুর্গে রহিলেন। সাধুবাবাকে বৃক্ষমূল হইতে কেহ তাড়াইবার চেষ্টা করিল না। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরায়, বেদেদের লইয়া যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তাহার পুনরভিনয় বাঞ্ছনীয় নয়।

উত্তরখণ্ড

১

একদিন কার্তিক মাসের সকালবেলা ব্যোমকেশ ও আমি আমাদের হ্যারিসন রোডের বাসায় ডিম্ব সহযোগে চা-পান শেষ করিয়া খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিলাম। সত্যবতী বাড়ির ভিতর গৃহকর্মে নিযুক্ত ছিল। পুঁটিরাম বাজারে গিয়াছিল।

ব্যোমকেশের বিবাহের পর আমি অন্য বাসা লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম; কারণ নব দম্পতির জীবন নির্বিঘ্ন করা বন্ধুর কাজ। কিন্তু ব্যোমকেশ ও সত্যবতী আমাকে যাইতে দেয় নাই। সেই অবধি এই চার বছর আমরা একসঙ্গে বাস করিতেছি। ব্যোমকেশকে পাইয়া আমার ভ্রাতার অভাব দূর হইয়াছিল; সত্যবতীকে পাইয়াছি একাধারে ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূরূপে। উপরন্তু সম্প্রতি ভ্রাতুষ্পুত্র লাভের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়াছে। আশাতীত সুখ ও শান্তির মধ্যে জীবনের দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছে।

ভাগ করিয়া খবরের কাগজ পাঠ চলিতেছিল। সামনের পাতা আমি লইয়াছিলাম, ব্যোমকেশ লইয়াছিল ভিতরের পাতা। সংবাদপত্রের সদরে মোটা অক্ষরে যেসব খবর ছাপা হয়, তাহার প্রতি ব্যোমকেশের আসক্তি নাই, সদরের চেয়ে অলিগলিতেই তাহার মনের যাতায়াত বেশী।

হঠাৎ কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানচন্দ্র মজুমদারের নাম জানো?'

চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কে তিনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। বহরমপুরে আমি কিছুদিন তাঁর ছাত্র ছিলাম। ভদ্রলোক মারা গেছেন।'

বলিলাম, 'তা তুমি যখন তাঁর ছাত্র, তখন তাঁর মরবার বয়স হয়েছিল বলতে হবে।'

'তা হয়তো হয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। সর্পাঘাতে মারা গেছেন।'

'ও!'

'গত বছর আমরা যেখানে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে গিয়েছিলাম, তিনি এ বছর সেখানে গিয়েছিলেন। সেইখানেই মৃত্যু হয়েছে।'

সাঁওতাল পরগণার সেই পাহাড়-ঘেরা শহরটি! সেখানে কয় হপ্তা বড় আনন্দে ছিলাম, যাহাদের স্মৃতি ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের কথা মনে পড়িয়া গেল। মহীধরবাবু, পুরন্দর পাণ্ডে, ডাক্তার ঘটক, রজনী—

বহির্দ্বারের কড়া নাড়িয়া উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, ডাকপিওন। একখানা খামের চিঠি, ব্যোমকেশের নামে। আমাদের চিঠিপত্র বড় একটা আসে না। ব্যোমকেশকে চিঠি দিয়া উৎসুকভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

চিঠি পড়িয়া সে সহাস্যে মুখ তুলিল, বলিল, 'কার চিঠি বল দেখি?'

বলিলাম, 'তা কি করে জানব। আমার তো রেডিও-চক্ষু নেই!'

'ডি এস পি পুরন্দর পাণ্ডের চিঠি।'

সবিস্ময়ে বলিলাম, 'বল কি!' এইমাত্র যে তার কথা ভাবছিলাম।

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আমিও। শুধু তাই নয়, অধ্যাপক মজুমদারের প্রসঙ্গও আছে।'

'আশ্চর্য!'

ব্যোমকেশ বলিল,'এরকম আশ্চর্য ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটে। অনেকদিন যার কথা ভাবিনি তাকে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তারপর সে সশরীরে এসে হাজির হল।—পণ্ডিতেরা বলেন, 'কইনসিডেন্স'—সমাপতন। কিন্তু এর রহস্য আরও গভীর। কোথাও একটা যোগসূত্র আছে, আমরা দেখতে পাই না—'

'সে যাক। পাণ্ডে লিখেছেন কি?'

'প'ড়ে ছাখো।'

চিঠি পড়িলাম। পাণ্ডে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই:—

সম্প্রতি এখানে একটি রহস্যময় ব্যাপার ঘটিয়াছে। শহর হইতে কিছু দূরে পাহাড়ের উপর এক সমৃদ্ধ পরিবার বাস করেন; গৃহস্বামীর এক বৃদ্ধ বন্ধু ঈশান মজুমদার বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর কারণ সর্পাঘাত বলিয়াই প্রকাশ, কিন্তু এ বিষয়ে

শব-ব্যবচ্ছেদক ডাক্তার এবং পুলিশের মনে সন্দেহ হইয়াছে।...ব্যোমকেশ-বাবু রহস্য ভালবাসেন; তার উপর এখন শীতকাল, এখানকার জল-বায়ু অতি মনোরম। তিনি যদি সবান্ধবে আসিয়া কিছু দিনের জন্য দীনের গরীবখানায় আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রথ-দেখা কলা-বেচা দুইই হইবে।

চিঠি পড়া শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'কি বল?'

বলিলাম, 'মন্দ কি। এখানে তোমার কাজকর্মও তো কিছু দেখছি না। কিন্তু সত্যবতী—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকে এ অবস্থায় কোথাও নিয়ে যাওয়া চলে না—

'তা বটে। কিন্তু ও যদি যেতে চায়? কিম্বা যদি তোমাকে না ছাড়তে চায়? এ সময় মেয়েদের মন বড় অবুঝ হয়ে পড়ে, কখন কি চায় বোঝা যায় না—' ভিতর দিকে পায়ের শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেলাম।

সত্যবতী প্রবেশ করিল। অবস্থাবশে তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে দেহাকৃতি ডিম-ভরা কৈ মাছের মত। সে আসিয়া একটা চেয়ারে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। আমরা নীরব রহিলাম। সত্যবতী তখন ক্লান্তিভরে বলিল, 'আমাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দাও। এখানে আর ভাল লাগছে না।'

ব্যোমকেশের সহিত আমার চোখে চোখে বার্তা বিনিময় হইয়া গেল। সে বলিল, 'ভাল লাগছে না! ভাল লাগছে না কেন?'

সত্যবতী উত্তাপহীন স্বরে বলিল, 'তোমাদের আর সহ্য হচ্ছে না। দেখছি আর রাগ হচ্ছে।'

ইহা নিশ্চয় এই সময়ের একটা লক্ষণ, নচেৎ আমাদের দেখিয়া রাগ হইবার কোনও কারণ নাই। ব্যোমকেশ একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাও তাহলে, আটকাব না। অজিত তোমাকে সুকুমারের ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসুক।—আর আমরাও না হয় এই ফাঁকে কোথাও ঘুরে আসি।'

টেলিগ্রাম পাইয়া পুরন্দর পাণ্ডে মহাশয় ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, আমাদের নামাইয়া লইলেন। তাঁহার বাসায় পৌঁছিয়া অপর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ করিতে করিতে পরিচিত ব্যক্তিদের খোঁজ খবর লইলাম। সকলেই

'আর তাঁর মুঠির মধ্যে যে মোহর পাওয়া গিয়েছিল সেটা?'

'সেটাও আমাদের জিম্মায় আছে। এ মামলার একটা নিষ্পত্তি হলে সব জিনিস তাঁর ওয়ারিশকে ফেরৎ দিতে হবে।'

ব্যোমকেশ আরও কিছুক্ষণ ঘর পরীক্ষা করিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না। তখন সে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'চলুন। এখানকার দেখা শেষ হয়েছে।'

দুর্গ প্রাঙ্গণে আসিয়া আমরা তোরণের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, একটি ছোকরা তোরণ দিয়া প্রবেশ করিল। মাস্টার রমাপতিকে এই প্রথম দেখিলাম। ছিপ্‌ছিপে গড়ন, ময়লা রঙ, চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ; কিন্তু সঙ্কুচিত ভাব। বয়স উনিশ-কুড়ি। তাহাকে দেখিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'কি মাষ্টার, কি খবর?'

রমাপতি একটু অপ্রতিভ হাসিয়া বলিল, 'বাড়িতে ডাক্তারবাবু আর উকিলবাবু এসেছেন। তাঁদের নিয়ে কর্তার ঘরে কি সব কাজের কথা হচ্ছে। বড়রা সবাই সেখানে আছেন। কিন্তু গদাই আর তুলসীকে দেখতে পেলাম না, তাই ভাবলাম হয়তো তারা এখানে এসেছে।'

'না, তাদের তো এখানে দেখিনি!' পাণ্ডে আমাদের সহিত রমাপতির পরিচয় করাইয়া দিলেন, 'এঁরা আমার বন্ধু, এখানে বেড়াতে এসেছেন।'

রমাপতি একদৃষ্টে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া থাকিয়া সংহত স্বরে বলিল, 'আপনি কি—সত্যান্বেষী ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'হ্যাঁ! কিন্তু চিনলেন কি করে? আমার ছবি তো কোথাও বেরোয়নি।'

রমাপতি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, স্খলিত স্বরে বলিল, 'আমি—না, ছবি দেখিনি—কিন্তু দেখে মনে হল—আপনার বই পড়েছি—ক'দিন ধরে মনে হচ্ছিল—আপনি যদি আসতেন তাহলে নিশ্চয় এই ব্যাপারের মীমাংসা হত—' সে থতমত খাইয়া চুপ করিল।

ব্যোমকেশ সদয় হাসিয়া বলিল, 'আসুন, আপনার সঙ্গে খানিক গল্প করা যাক।'

নিকটেই কামান পড়িয়াছিল, ব্যোমকেশ রুমাল দিয়া ধুলা ঝাড়িয়া

তাহার উপর বসিল, পাশের স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, 'বসুন।' রমাপতি সসঙ্কোচে তাহার পাশে বসিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি বললেন আমি এলে এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে। ঈশানবাবু তো সাপে কামড়ে মারা গেছেন। এর মীমাংসা কী হবে?'

রমাপতি উত্তর দিল না, শঙ্কিত নতমুখে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া অঙ্গুষ্ঠের নখ খুঁটিতে লাগিল। ব্যোমকেশ তাহার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া সহজ স্বরে বলিল, 'যাক ও কথা। ঈশানবাবু যে-রাত্রে মারা যান সে-রাত্রে প্রায় সাড়ে ন'টা পর্যন্ত আপনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কি কথা হচ্ছিল?'

রমাপতি এবার সতর্কভাবে উত্তর দিল, বলিল, 'উনি আমাকে স্নেহ করতেন। আমি ওঁর কাছে এলে আমার সঙ্গে নানারকম গল্প করতেন। সে রাত্রে—'

'সে-রাত্রে কোন্ গল্প বলছিলেন?'

'এই দুর্গের ইতিহাস বলছিলেন।'

'দুর্গের ইতিহাস! তাই নাকি! কি ইতিহাস শুনলেন বলুন তো, আমরাও শুনি।'

আমি ও পাণ্ডে গিয়া কামানের উপর বসিলাম। রমাপতি যে গল্প শুনিয়াছিল তাহা বলিল। রাজা জানকীরাম হইতে আরম্ভ করিয়া সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাজারাম ও জয়রাম পর্যন্ত কাহিনী বলিয়া গেল।

শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, সত্যি ইতিহাস বলেই মনে হয়। কিন্তু এ ইতিহাস তো পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায় না। ঈশানবাবু জানলেন কি করে?'

রমাপতি বলিল, 'উনি সব জানতেন। কর্তার এক ভাই ছিলেন কম বয়সে মারা যান, তাঁর নাম ছিল রামবিনোদ সিংহ, অধ্যাপক মশায় তাঁর প্রাণের বন্ধু ছিলেন। তাঁর মুখে উনি এসব কথা শুনেছিলেন; রামবিনোদবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর বংশের সব ইতিহাস এঁর জানা ছিল। একটা খাতায় সব লিখেছিলেন।'

'খাতায় লিখে রেখেছিলেন? কোথায় খাতা?'

'এখন খাতা কোথায় তা জানি না। কিন্তু আমি দেখেছি। বোধহয় ওঁর তোরঙ্গর মধ্যে আছে।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডের পানে তাকাইল। পাণ্ডে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'পেন্সিলে লেখা একটা খাতা আছে, কিন্তু তাতে কি লেখা আছে তা জানিনা। বাংলায় লেখা।'

'দেখতে হবে; যা হোক—' ব্যোমকেশ রমাপতির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আপনার কাছে অনেক খবর পাওয়া গেল।—আচ্ছা, পরদিন সকালে সবার আগে আপনি আবার দুর্গে এসেছিলেন কেন, বলুন তো?'

রমাপতি বলিল, 'উনি আমাকে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন, আজ এই পর্যন্ত থাক, কাল ভোরবেলা এসো, বাকি গল্পটা বলব।'

'বাকি গল্পটা মানে—?'

'তা কিছু খুলে বলেন নি। তবে আমার মনে হয়েছিল যে সিপাহী যুদ্ধের পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এ বংশের ইতিহাস আমাকে শোনাবেন।

'কিন্তু কেন? আপনাকে এ ইতিহাস শোনাবার কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি?'

'তা জানি না; তাঁর যখন যা মনে আসত আমাকে বলতেন; আমারও ভাল লাগত তাই শুনতাম। মোগল-পাঠান আমলের অনেক গল্প বলতেন। একদিন বলেছিলেন, যে-বংশে একবার ভ্রাতৃহত্যার বিষ প্রবেশ করেছে সে-বংশের আর রক্ষা নেই; যতবড় বংশই হোক তার ধ্বংস অনিবার্য। এই হচ্ছে ইতিহাসের সাক্ষ্য।'

আমরা পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। পাণ্ডের ললাট ভ্রূকুটি-বন্ধুর হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে। চলুন এবার ওদিকে যাওয়া যাক।'

খাদের ওপারে বাড়ির আড়ালে সূর্য তখন ঢাকা পড়িয়াছে।

৩

দেউড়ী পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া দেখিলাম, বুলাকিলাল দুইটি বৃহৎ পাত্রে ভাঙের সরবৎ লইয়া ঢালাঢালি করিতেছে; গদাধর এবং তুলসী পরম আগ্রহ-ভরে দাঁড়াইয়া প্রক্রিয়া দেখিতেছে।

আমাদের আগমনে গদাধর বিরাট হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল ; তুলসী সংশয়-সঙ্কুল চক্ষু আমাদের উপর স্থাপন করিয়া কোণাচে ভাবে সরিয়া গিয়া মাস্টার রমাপতির হাত চাপিয়া ধরিল। রমাপতি তিরস্কারের সুরে বলিল, 'কোথায় ছিলে তোমরা? আমি চারিদিকে তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

তুলসী জবাব দিল না, অপলক দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া রহিল। গদাধরের গলা হইতে একটি ঘড়্ ঘড়্ হাসির শব্দ বাহির হইল। সে বলিল, 'সাধু বাবা গাঁজা খাচ্ছিল তাই দেখছিলাম।'

রমাপতি ধমক দিয়া বলিল, 'সাধুর কাছে যেতে তোমাদের মানা করা হয় নি?'

গদাধর বলিল, 'কাছে তো যাইনি, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।'

'আচ্ছা, হয়েছে—এবার বাড়ি চল', রমাপতি তাহাদের লইয়া বাড়ির দিকে চলিল। শুনিতে পাইলাম, কয়েক ধাপ উঠিবার পর তুলসী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিতেছে, 'মাষ্টারমশাই, ওরা সব কারা?'

বুলাকিলাল গেলাস ভরিয়া আমাদের হাতে দিল। দধি গোলমরিচ শসার বীচি এবং আরও বহুবিধ বকাল সহযোগে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ভাঙের সরবৎ ; এমন সরবৎ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ছাড়া আর কোথাও প্রস্তুত হয় না। পাণ্ডে তারিফ করিয়া বলিলেন, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে। কিন্তু বুলাকিলাল, তুমি এত ভাঙ তৈরী করেছ কার জন্য? আমরা আসব তা তো জানতে না।'

বুলাকিলাল বলিল, 'হুজুর, আমি আছি, সাধু-বাবাও এক ঘটি চড়ান্—'

'সাধু বাবার দেখছি কিছুতেই অরুচি নেই। আর—'

'আর—গণপৎ এক ঘটি নিয়ে যায়।'

'গণপৎ—মুরলীধরের খাস চাকর? নিজের জন্যে নিয়ে যায়, না মালিকের জন্যে?'

'তা জানি না হুজুর।'

'আচ্ছা বুলাকিলাল, তুমি তো এ বাড়ির পুরানো চাকর, বাড়িতে কে কোন্ নেশা করে বলতে পারো?'

২

বৈকালে পুলিসের মোটর চড়িয়া তিনজনে বাহির হইলাম। ছয় মাইল পাথুরে পথ অতিক্রম করিতে আধ ঘণ্টা লাগিল।

কূয়ার নিকট অবধি পৌঁছিয়া দেখা গেল সেখানে আর একটি মোটর দাঁড়াইয়া আছে। আমরাও এখানে গাড়ি হইতে নামিলাম; পাণ্ডে বলিলেন, 'ডাক্তার ঘটকের গাড়ি। আবার কারুর অসুখ নাকি!'

প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, আমাদের পরিচিত ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক এ বাড়ির গৃহ-চিকিৎসক। বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছি, দৃষ্টি পড়িল কুয়ার ওপারে তরুগুচ্ছ হইতে মৃদুমন্দ ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা কি? ওখানে ধোঁয়া কিসের?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'একটা সাধু ওখানে আড্ডা গেড়েছে।'

'সাধু! এই জঙ্গলের মধ্যে সাধু! এখানে তো ভিক্ষা পাবার কোনও আশা নেই।'

'তা নেই। কিন্তু রামকিশোরবাবুর বাড়ি থেকে বোধ হয় বাবাজীর সিধে আসে।'

'ও। কতদিন আছেন এখানে বাবাজি?'

'ঠিক জানি না। তবে অধ্যাপক মহাশয়ের মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই আছেন।'

'তাই নাকি? চলুন, একবার সাধু দর্শন করা যাক।'

একটি গাছের তলায় ধুনী জ্বালিয়া কৌপীনধারী বাবাজী বসিয়া আছেন। আমরা কাছে গিয়া দাঁড়াইলে তিনি জবারক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, কিছুক্ষণ অপলকনেত্রে আমাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর শ্মশ্রুসমাকুল মুখে একটি বিচিত্র নীরব হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।

কিছুক্ষণ অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। পথে-ঘাটে যেসব ভিক্ষাজীবী সাধু-সন্ন্যাসী দেখা যায় ইনি ঠিক সেই জাতীয় নন। কোথায় যেন একটা তফাৎ আছে। কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিক আভিজাত্য কিনা বুঝিতে পারিলাম না।

পাণ্ডে বলিলেন, 'এবার কোথায় যাবেন? আগে রামকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন, না দুর্গ দেখবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুর্গটাই আগে দেখা যাক।'

দেউড়ির পাশ দিয়া দুর্গের সিঁড়ি ধরিব, মোটয় চালক বুলাকিলাল তাহার কোটর হইতে বাহিরে আসিয়া ডি এস্ পি সাহেবকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডে বলিলেন, 'বুলাকিলাল, ডাক্তার এসেছে কেন? কারুর কি অসুখ?'

বুলাকিলাল বলিল, 'না হুজুর, ডাক্তার সাহেব এসেছে, উকিল সাহেবও এসেছেন। কি জানি কি গুফ্‌ত-গু হচ্ছে।'

'উকিল? হিমাংশুবাবু?'

'জি হুজুর। একসঙ্গে এসেছেন। এত্তালা দেব?'

'থাক, আমরা নিজেরাই যাব।'

বুলাকিলাল তখন হাত জোড় করিয়া বলিল, 'হুজুর, ঠাণ্ডাই তৈরি করছি। যদি হুকুম হয়'—

'ঠাণ্ডাই—ভাঙ? বেশ তো, তুমি তৈরি কর, আমরা দুর্গ দেখে এখনই ফিরে আসছি।'

'জী সরকার।'

আমরা তখন সিঁড়ি ধরিয়া দুর্গের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। পাণ্ডে হাসিয়া বলিলেন, 'বুড়ো বুলাকিলাল খাসা ভাঙ্ তৈরি করে। ঐ নিয়েই আছে।'

পঁচাত্তরটি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দুর্গতোরণে উপনীত হইলাম। তোরণের কবাট নাই, বহু পূর্বেই অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু পাথরের খিলান এখনও অটুট আছে। গতাগতির বাধা নাই।

তোরণপথে প্রবেশ করিয়া সর্বাগ্রে যে বস্তুটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহা একটি কামান। প্রথম দেখিয়া মনে হয় তাল গাছের একটা গুঁড়ি মুখ উঁচু করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। দুই শতাব্দীর রৌদ্রবৃষ্টি অনাবৃত কামানের দশ হাত দীর্ঘ দেহটিকে মরিচা ধরাইয়া শল্কাবৃত করিয়া তুলিয়াছে। প্রায় নিরেট লৌহস্তম্ভটি জগদ্দল ভারি, বহুকাল কেহ তাহাকে

নাড়াচাড়া করে নাই। তাহার ভিতরের গোলা ছুঁড়িবার ছিদ্রটি বেশী ফাঁদালো নয়, কোনও ক্রমে একটি ছোবড়া-ছাড়ানো নারিকেল তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাও বর্তমানে ধুলামাটিতে ভরাট হইয়া গিয়াছে; মুখের দিকটায় একগুচ্ছ সজীব ঘাস মাথা বাহির করিয়া আছে। অতীতের সাক্ষী ক্ষয়িষ্ণু দুর্গটির তোরণমুখে ভূপতিত কামানটিকে দেখিয়া কেমন যেন মায়া হয়; মনে হয় যৌবনে যে বলদৃপ্ত যোদ্ধা ছিল, জরার বসে ধরাশায়ী হইয়া সে উর্দ্ধমুখে মৃত্যুর দিন গুণিতেছে।

কামান ছাড়া অতীতকালের অস্থাবর বস্তু দুর্গমধ্যে আর কিছু নাই। প্রাকার-ঘেরা দুর্গভূমি আয়তনে দুই বিঘার বেশী নয়; সমস্তটাই পাথরের পাটি দিয়া বাঁধানো। চক্রাকার প্রাকারের গায়ে ছোট ছোট কুঠুরি; বোধহয় পূর্বকালে এগুলিতে দুর্গরক্ষক সিপাহীরা থাকিত। এগুলির অবস্থা ভগ্নপ্রায়; কোথাও পাথর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও দ্বারের সম্মুখে কাঁটাগাছ জন্মিয়াছে। এই চক্রের মাঝখানে নাভির ন্যায় দুর্গের প্রধান ভবন। নাভি ও নেমির মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের অবকাশ।

গৃহটি চতুষ্কোণ এবং বাহির হইতে দেখিলে মজবুত বলিয়া মনে হয়। পাঁচ ছয়টি ছোট বড় ঘর লইয়া গৃহ; মামুলিভাবে মেরামৎ করা সত্ত্বেও সব ঘরগুলি বাসের উপযোগী নয়। কোনও ঘরের দেয়ালে ফাটল ধরিয়াছে, কোনও ঘরের ছাদ ফুটা হইয়া আকাশ দেখা যায়। কেবল পিছন দিকের একটি ছোট ঘর ভাল অবস্থায় আছে। যদিও চূণ স্থুরকি খসিয়া স্থূল পাথরের গাঁথুনি প্রকট হইয়া পড়িয়াছে তবু ঘরটিকে বাসোপযোগী করিবার জন্য তাহার প্রবেশ-পথে নূতন চৌকাঠ ও কবাট লাগানো হইয়াছে।

আমরা অন্যান্য ঘরগুলি দেখিয়া এই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডে চৌকাঠের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, 'অধ্যাপক মহাশয়ের লাশ ঐখানে প'ড়ে ছিল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'সাপে কামড়াবার পর তিনি যদি চৌকাঠে মাথা ঠুকে পড়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে মাথায় চোট লাগা অসম্ভব নয়।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'না, অসম্ভব নয়। কিন্তু সারা বাড়িটা আপনি

দেখেছেন ; ভাঙ্গা বটে কিন্তু কোথাও এমন আবর্জনা নেই যেখানে সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে। অধ্যাপক মহাশয় বাস করতে আসার সময় এখানে ভাল করে কার্বলিক অ্যাসিডের জল ছড়ানো হয়েছিল, তারপরও তিনি বেঁচে থাকাকালে বার দুই ছড়ানো হয়েছে—'

'অধ্যাপক মহাশয় আসবার আগে এখানে কেউ বাস করত না ?'

পাণ্ডে মুখ টিপিয়া বলিল, 'কেউ কবুল করে না। কিন্তু মুরলীধর—'

'হুঁ—বুঝেছি' বলিয়া ব্যোমকেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘরটি লম্বায় চওড়ায় আন্দাজ চৌদ্দ ফুট। মেঝে শান বাঁধানো। একপাশে একটি তক্তপোশ এবং একটি আরাম-কেদারা ছাড়া ঘরে অন্য কোনও আসবাব নাই। অধ্যাপক মহাশয়ের ব্যবহারের জন্য যে সকল তৈজস ছিল তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছে।

এই ঘরে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম যাহা অন্য কোনও ঘরে নাই। তিনটি দেয়ালে মেঝে হইতে প্রায় এক হাত ঊর্ধ্বে সারি সারি লোহার গজাল ঠোকা রহিয়াছে, গজালগুলি দেয়াল হইতে দেড় হাত বাহির হইয়া আছে। সেগুলি আগে বোধহয় শাবলের মত স্থূল ছিল, এখন মরিচা ধরিয়া যেরূপ ভঙ্গুর আকৃতি ধারণ করিয়াছে তাহাতে মনে হয় সেগুলি জানকীরামের সমসাময়িক।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেয়ালে গোঁজ কেন ?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'এ ঘরটা বোধহয় সকালে দুর্গের দপ্তর কিম্বা খাজনাখানা ছিল। গোঁজের ওপর তক্তা পেতে দিলে বেশ তাক হয়, তাকের ওপর নানান জিনিসপত্র, বহি খাতা, এমন কি টাকার সিন্দুক রাখা চলত। এখনও বিহারের অনেক সাবেক বাড়িতে এইরকম গোঁজ দেখা যায়।'

ব্যোমকেশ ঘরের মেঝে ও দেয়ালের উপর চোখ বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। এক সময় বলিল, 'অধ্যাপক মহাশয় নিশ্চয় বাক্স-বিছান এনেছিলেন। সেগুলো কোথায় ?'

'সেগুলো আমাদের অর্থাৎ পুলিসের জিম্মায় আছে।'

'বাক্সর মধ্যে কি আছে দেখেছেন ?'

'গোটাকয়েক জামা কাপড় আর খান-তিন-চার বইখাতা। একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা তিনটে দশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো টাকা পয়সা ছিল।'

বুলাকিলাল একটু চুপ করিয়া বলিল, 'বড়কর্তা সন্ধ্যের পর আফিম খান। আর কারুর কথা জানি না ধর্মাবতার।'

বোঝা গেল, জানিলেও বুলাকিলাল বলিবে না। আমরা সরবৎ শেষ করিয়া, আর এক প্রস্থ তারিফ করিয়া বাড়ির সিঁড়ি ধরিলাম।

এদিকেও সিঁড়ির সংখ্যা সত্তর-আশী। উপরে উঠিয়া দেখা গেল, সূর্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও বেশ আলো আছে। বাড়ির সদরে রমাপতি উপস্থিত ছিল, সে বলিল, 'কর্তার সঙ্গে দেখা করবেন? আসুন।'

রমাপতি আমাদের যে ঘরটিতে লইয়া গেল সেটি বাড়ির বৈঠকখানা। টেবিল চেয়ার ছাড়াও একটি ফরাস ঢাকা বড় তক্তপোশ আছে। তক্তপোশের মধ্যস্থলে রামকিশোরবাবু আসীন; তাঁহার একপাশে নায়েব চাঁদমোহন, অপর পাশে জামাই মণিলাল; দুই ছেলে বংশীধর ও মুরলীধর তক্তপোশের দুই কোণে বসিয়াছে। ডাক্তার ঘটক এবং উকিল হিমাংশুবাবু তক্তপোশের কিনারায় চেয়ার টানিয়া উপবিষ্ট আছেন। পশ্চিমদিকের খোলা জানালা দিয়া ঘরে আলো আসিতেছে; তবু ঘরের ভিতরটা ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে।

ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে শুনিতে পাইলাম, মুরলীধর পেঁচালো স্বরে বলিতেছে, 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দৈ। মণিলালকে দুর্গ দেওয়া হবে কেন? আমি কি ভেসে এসেছি? দুর্গ আমি নেব।'

বংশীধর অমনি বলিয়া, উঠিল, 'তুমি নেবে কেন? আমার দাবী আগে, দুর্গ আমি নেব। আমি ওটা মেরামত করিয়ে ওখানে বাস করব।'

রামকিশোর বারুদের মত ফাটিয়া পড়িলেন, 'খবরদার! আমার মুখের ওপর যে কথা বলবে জুতিয়ে তার মুখ ছিঁড়ে দেব। আমার সম্পত্তি আমি যাকে ইচ্ছে দিয়ে যাব। মণিলালকে আমি সর্বস্ব দিয়ে যাব, তোমাদের তাতে কি! বেয়াদব কোথাকার!'

মণিলাল শান্তস্বরে বলিল, 'আমি তো কিছুই চাইনি—'

মুরলীধর মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'না কিছুই চাওনি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বাবাকে বশ করেছ। মিট্‌মিটে ডান—'

রামকিশোর আবার ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিলেন, ডাক্তার

ঘটক হাত তুলিয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবু, আপনি বড় বেশী উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন, আপনার শরীরের পক্ষে ওটা ভাল নয়। আজ বরং কথাবার্তা বন্ধ থাক্, আর একদিন হবে।'

রামকিশোরবাবু ঈশৎ সংযত হইয়া বলিলেন, 'না ডাক্তার, এ ব্যাপার টাঙিয়ে রাখা চলবে না। আজ আছি কাল নেই, আমি সব হাঙ্গামা চুকিয়ে রাখতে চাই। হিমাংশুবাবু, আমি আমার সম্পত্তির কি রকম ব্যবস্থা করতে চাই আপনি শুনেছেন; আর বেশী আলোচনার দরকার নেই। আপনি দলিলপত্র তৈরি করতে আরম্ভ করে দিন। যত শিগ্‌গির দলিল রেজিষ্ট্রি হয়ে যায় ততই ভাল।'

'বেশ, তাই হবে। আজ তাহলে ওঠা যাক্।' হিমাংশুবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। এতক্ষণে সকলের নজর পড়িল যে আমরা তিনজন ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি। রামকিশোর ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন, 'কে?'

পাণ্ডে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, 'আমি। আমার দুটি কলকাতার বন্ধু বেড়াতে এসেছেন, তাঁদের দুর্গ দেখাতে এনেছিলাম।' বলিয়া ব্যোমকেশের ও আমার নামোল্লেখ করিলেন।

রামকিশোর সমাদর সহকারে বলিলেন, 'আসুন, আসুন। বসতে আজ্ঞে হোক।' কিন্তু তিনি ব্যোমকেশের নাম পূর্বে শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না।

বংশীধর ও মুরলীধর উঠিয়া গেল। ডাক্তার ঘটক আমাদের দেখিয়া একটু বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইল, তারপর হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। ডাক্তারের সঙ্গে দু'একটা কথা হইবার পর সে উকিল হিমাংশুবাবুকে লইয়া প্রস্থান করিল। ঘরের মধ্যে রহিয়া গেলাম আমরা তিনজন এবং ও-পক্ষে রামকিশোরবাবু, নায়েব চাঁদমোহন এবং জামাই মণিলাল।

রামকিশোর হাঁকিলেন, 'ওরে কে আছিস, আলো দিয়ে যা, চা তৈরি কর।

চাঁদমোহন বলিলেন, 'আমি দেখছি—'

তিনি উঠিয়া গেলেন, চাঁদমোহনের চেহারা কালো এবং চিম্‌শে কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ধূর্ততা ভরা। তিনি যাইবার সময় ব্যোমকেশের প্রতি একটি দীর্ঘ-গম্ভীর অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন।

দুই চারিটি সৌজন্যসূচক বাক্যালাপ হইল। বাহিরের লোকের সহিত রামকিশোরের ব্যবহার বেশ মিষ্ট ও অমায়িক। তারপর ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনলাম ঈশানবাবু এখানে এসে সর্পাঘাতে মারা গেছেন। আমি তাঁকে চিনতাম, একসময় তাঁর ছাত্র ছিলাম।'

'তাই নাকি!' রামকিশোর চকিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, 'আমার বড় ছেলেও—। কি বলে, ঈশান আমার প্রাণের বন্ধু ছিল, ছেলেবেলার বন্ধু। সে আমার বাড়িতে বেড়াতে এসে অপঘাতে মারা গেল, এ লজ্জা আমি জীবনে ভুলব না।' তাঁহার কথার ভাবে মনে হইল, সর্পাঘাতে মৃত্যু সম্বন্ধে যে সন্দেহ আছে তাহা তিনি জানেন না।

ব্যোমকেশ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল, 'বড়ই দুঃখের বিষয়। তিনি আপনার দাদারও বন্ধু ছিলেন?'

রামকিশোর ক্ষণেক নীরব থাকিয়া যেন একটু বেশী ঝোঁক দিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু দাদা প্রায় ত্রিশ বছর হল মারা গেছেন।'

'ও—তাহলে বর্তমানে আপনার সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।— আচ্ছা, তিনি এবার এখানে আসার আগে এ বাড়ির কে কে তাঁকে চিনতেন? আপনি চিনতেন। আর—?'

'আর আমার নায়েব চাঁদমোহন চিনতেন।'

'আপনার ড্রাইভারতো পুরানো লোক, সে চিনত না?'

'হ্যাঁ, বুলাকিলাল চিনত।'

'আর, আপনার বড় ছেলেও বোধহয় তাঁর ছাত্র ছিলেন?'

গলাটা পরিষ্কার করিয়া রামকিশোর বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

'এই বাক্যালাপ যখন চলিতেছিল তখন জামাই মণিলালকে লক্ষ্য করিলাম। ভোজনরত মানুষের পাতের কাছে বসিয়া পোষা বিড়াল যেমন একবার পাতের দিকে একবার মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে চক্ষু সঞ্চালন করে, মণিলাল তেমনি কথা বলার পর্যায়ক্রমে ব্যোমকেশ ও রামকিশোরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছে। তাহার মুখের ভাব আধা-অন্ধকারে ভাল ধরা গেল না, কিন্তু সে যে একাগ্রমনে বাক্যালাপ শুনিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, ঈশানবাবুর মুঠিতে একটি মোহর পাওয়া গিয়েছিল। সেটি কোথা থেকে এল বলতে পারেন?'

রামকিশোর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। ঈশানের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। অন্তত মোহর নিয়ে বেড়াবার মত ছিল না।'

'দুর্গে কোথাও কুড়িয়ে পাওয়া সম্ভব নয় কি?'

রামকিশোর বিবেচনা করিয়া বলিলেন, 'সম্ভব। কারণ আমার পূর্বপুরুষদের অনেক সোনা-দানা ঐ দুর্গে সঞ্চিত ছিল। সিপাহীরা যখন লুঠ করতে আসে তখন এক-আধটা মোহর এদিক ওদিক ছিটকে পড়া বিচিত্র নয়। তা যদি হয় তাহলে ও মোহর আমার সম্পত্তি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার সম্পত্তি হলে ঈশানবাবু মোহরটি আপনাকে ফেরত দিতেন না কি?' আমি যতদুর জানি, পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার লোক তিনি ছিলেন না।'

'তা ঠিক। কিন্তু অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। তাছাড়া, মোহরটা কুড়িয়ে পাবার সময়েই হয়তো তাকে সাপে কামড়েছিল। বেচারা সময় পায়নি।'

এই সময় একজন ভৃত্য কেরোসিনের ল্যাম্প আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল, অন্য একজন ভৃত্য চা এবং জলখাবারের ট্রে লইয়া আমাদের সম্মুখে ধরিল। আমরা সবিনয়ে জলখাবার প্রত্যাখ্যান করিয়া চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইলাম।

চায়ে চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা নেই। ঈশানবাবুও নিশ্চয় রাত্রে কেরোসিনের লণ্ঠন ব্যবহার করতেন?'

রামকিশোর বলিলেন, 'হ্যাঁ। তবে মৃত্যুর হপ্তাখানেক আগে সে একবার আমার কাছ থেকে একটা ইলেকট্রিক টর্চ চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর আর সব জিনিসই পাওয়া গেল, কেবল ঐ টর্চটা পাওয়া যায়নি।'

'তাই নাকি! কোথায় গেল টর্চটা?'

এতক্ষণে মণিলাল কথা কহিল, গম্ভীর মুখে বলিল, 'আমার বিশ্বাস ঐ ঘটনার পরদিন সকালবেলা গোলমালে কেউ টর্চটা সরিয়েছে।'

পাণ্ডে প্রশ্ন করিলেন, 'কে সরাতে পারে? কারুর ওপর সন্দেহ হয়?'

মণিলাল উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিয়াছিল, রামকিশোর মাঝখানে বলিয়া উঠিলেন, 'না না, মণি, ও তোমার ভুল ধারণা। রমাপতি নেয় নি, নিলে স্বীকার করত।'

মণিলাল আর কথা কহিল না, ঠোঁট চাপিয়া বসিয়া রহিল। বুঝিলাম, টর্চ হারানোর প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে এবং মণিলালের সন্দেহ মাষ্টার রমাপতির উপর। একটা ক্ষুদ্র পারিবারিক মতান্তর ও অস্বাচ্ছন্দ্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

অতঃপর চা শেষ করিয়া আমরা উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'এই সূত্রে আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হল। বড় সুন্দর জায়গায় বাড়ি করেছেন। এখানে একবার এলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।'

রামকিশোর আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'বেশ তো, দু'দিন না হয় থেকে যান না। দু'দিন পরে কিন্তু প্রাণ পালাই পালাই করবে। আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে তাই থাকতে পারি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার নিয়ন্ত্রণ মনে রাখব। কিন্তু যদি আসি, ঐ দুর্গে থাকতে দিতে হবে। ক্ষুধিত পাষাণের মত আপনার দুর্গটা আমাকে চেপে ধরেছে।'

রামকিশোর বিরসমুখে বলিলেন, 'দুর্গে আর কাউকে থাকতে দিতে সাহস হয় না। যাহোক, যদি সত্যিই আসেন তখন দেখা যাবে।'

দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, কালো পর্দার আড়ালে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তুলসী এতক্ষণ পর্দার কাছে দাঁড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতেছিল, এখন সরীসৃপের মত সরিয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর পাণ্ডেজীর বাসার খোলা ছাদে তিনটি আরাম-কেদারায় আমরা তিনজনে অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছিলাম। অন্ধকারে ধূমপান চলিতেছিল। এখানে কার্তিক মাসের এই সময়টি বড় মধুর; দিনে একটু মোলায়েম গরম, রাত্রে মোলায়েম ঠাণ্ডা।

পাণ্ডে বলিলেন, 'এবার বলুন কি মনে হল।'

ব্যোমকেশ সিগারেটে দু'তিনটা টান দিয়া বলিল, 'আপনি ঠিক ধরেছেন,

গলদ আছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে যতক্ষণ না চেপে বসা যাচ্ছে ততক্ষণ গলদ ধরা যাবে না।'

'আপনি তো আজ তার গৌরচন্দ্রিকা করে এসেছেন। কিন্তু নিতান্তই কি দরকার—?'

'দরকার। এতদূর থেকে সুবিধা হবে না। ওদের সঙ্গে ভাল করে মিশতে হবে তবে ওদের পেটের কথা জানা যাবে। আজ লক্ষ্য করলাম, কেউ মন খুলে কথা কইছে না, সকলেই কিছু-না-কিছু চেপে যাচ্ছে।'

'হুঁ। তাহলে আপনার বিশ্বাস হয়েছে যে ঈশানবাবুর মৃত্যুটা স্বাভাবিক সর্পাঘাতের মৃত্যু নয়?'

'অতটা বলবার এখনও সময় হয় নি। এইটুকু বলতে পারি, আপাত-দৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে তা সত্যি নয়, ভেতরে একটা গূঢ় এবং চমকপ্রদ রহস্য রয়েছে। মোহর কোথা থেকে এল? টর্চটা কোথায় গেল? রমাপতি যে-গল্প শোনালে তা কি সত্যি? সবাই দুর্গটা চায় কেন? মণিলালকে কর্তা ছাড়া কেউ দেখতে পারে না কেন?'

আমি বললাম, 'মণিলালও রমাপতিকে দেখতে পারে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা স্বাভাবিক। ওরা দু'জনেই রামকিশোরবাবুর আশ্রিত। রমাপতিও বোধহয় মণিলালকে দেখতে পারে না। সেটা আমাদের পক্ষে সুবিধে।' দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেট ফেলিয়া দিয়া সে বলিল, 'আচ্ছা পাণ্ডেজি, বংশীধর কতদূর লেখাপড়া করেছে জানেন?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'ম্যাট্রিক পাশ করেছে জানি। তারপর বহরমপুরে পড়তে গিয়েছিল, কিন্তু মাস কয়েক পরেই পড়াশুনা বন্ধ ক'রে ঘরে ফিরে আসে।'

'গোলমাল ঠেকছে। বহরমপুরে ঈশানবাবুর সঙ্গে বংশীধরের জানা-শোনা হয়েছিল—তারপর বংশীধর হঠাৎ লেখাপড়া ছেড়ে দিলে কেন?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'খোঁজ নিতে পারি। বেশী দিনের কথা নয়, যদি গোলমাল থাকে কলেজের সেরেস্তায় হদিস পাওয়া যাবে।'

'খবর নেবেন তো।—আর মুরলীধরের বিদ্যে কতদূর?'

'ওটা আকাট্ মুখ্খু।'

'হুঁ, বংশটাই চাষাড়ে হয়ে গেছে। তবে রামকিশোরবাবুর ব্যবহারে একটা সাবেক ভদ্রতা আছে।'

'কিন্তু বাল্যবন্ধুর মৃত্যুতে খুব বেশী শোক পেয়েছেন বলে মনে হল না; মোহরটি বাগাবার মতলব।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, 'এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি।—কাল সকালে ঈশানবাবুর জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করতে হবে, খাতাটা পড়তে হবে। তাতে হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

'তারপর ?'

'তারপর দুর্গে গিয়ে গ্যাঁট্ হয়ে বসব। আপনি ব্যবস্থা করুন।'

'ভাল। কিন্তু একটা কথা, ওদের দেওয়া খাবার খাওয়া চলবে না। কি জানি কার মনে কি আছে—'

'হুঁ, ঠিক বলেছেন। আপনার ইক্‌মিক্ কুকার আছে ?'

'আছে।'

'ব্যস্, তাহলেই চলবে।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। ব্যোমকেশ আর একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'অজিত, রামকিশোরবাবুকে দেখে কিছু মনে হল ?'

'কি মনে হবে ?'

'আজ তাঁকে দেখেই মনে হল, আগে কোথায় দেখেছি। তোমার মনে হল না ?'

'কৈ না!'

'আমার কিন্তু এক নজর দেখেই মনে হ'ল চেনা লোক। কিন্তু কবে কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না।'

পাণ্ডে একটা হাই চাপিয়া বলিলেন, 'রামকিশোরবাবুকে আপনার দেখার সম্ভাবনা কম; গত পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি লোকালয়ে পা বাড়িয়েছেন কিনা সন্দেহ। আপনি হয়তো ওই ধরণের চেহারা অন্য কোথাও দেখে থাকবেন।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই হবে বোধ হয়।'

৪

পরদিন প্রাতরাশের সময় পাণ্ডে বলিলেন, 'দুর্গে গিয়ে থাকার সঙ্কল্প ঠিক আছে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, আপনি ব্যবস্থা করুন। বড় জোর দু-তিন দিন থাকব, বেশী নয়।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আমার কিন্তু মন চাইছে না। কি জানি যদি সত্যিই সাপ থাকে !'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'থাকলেও আমাদের কিছু করতে পারবে না। আমরা সাপের রোজা।'

'বেশ, আমি তাহলে রামকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব ঠিকঠাক করে আসি।—আচ্ছা, দুর্গের বদলে যদি রামকিশোরবাবুর বাড়িতে থাকেন তাতে ক্ষতি কি ?'

'অত ঘেঁষাঘেঁষি সুবিধা হবে না, পরিপ্রেক্ষিত পাব না। দুর্গই ভাল।'

'ভাল। আমি অফিসে বলে যাচ্ছি, আমার মুন্শী আতাউল্লাকে খবর দিলে সে ঈশানবাবুর জিনিসপত্র আপনাদের দেখাবে। গুদাম ঘরের চাবি তার কাছে।'

পাণ্ডেজী মোটর-বাইকে চড়িয়া প্রস্থান করিলেন। ঘড়িতে মাত্র ন'টা বাজিয়াছে, পাণ্ডেজির অফিস তাঁহার বাড়িতেই ; সুতরাং ঈশানবাবুর মালপত্র পরীক্ষার তাড়া নাই। আমরা সিগারেট ধরাইয়া সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইয়া গড়িমসি করিতেছি, এমন সময় একটি ছোট মোটর আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ জানালা দিয়া দেখিয়া বলিল, 'ডাক্তার ঘটক। ভালই হল।'

ডাক্তার ঘটকের একটু অনুতপ্ত ভাব। আমরা যে তাহার গুপ্তকথা ফাঁস করিয়া দিই নাই এবং ভবিষ্যতে দিব না তাহা সে বুঝিয়াছে। বলিল, 'কাল আপনাদের সঙ্গে ভাল করে কথা বলবার সুযোগ পেলাম না, তাই—'

ব্যোমকেশ পরম সমাদরের সহিত তাহাকে বসাইয়া বলিল, 'আপনি না এলে আমরাই যেতাম। কেমন আছেন বলুন। পুরোনো বন্ধুরা সব কেমন ? মহীধরবাবু ?'

ডাক্তার বলিল, 'সবাই ভাল আছেন।'

ব্যোমকেশ চক্ষু মিটিমিটি করিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'আর রজনী দেবী?'

ডাক্তারের কান দুটি রক্তাভ হইল, তারপর সে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'ভাল আছে রজনী। আপনারা এসেছেন শুনে জানতে চাইল মিসেস বক্সী এসেছেন কি না।'

'সত্যবতী এবার আসেনি। সে—' ব্যোমকেশ আমার পানে তাকাইল।

আমি সত্যবতীর অবস্থা জানাইয়া বলিলাম, 'সত্যবতী আমাদের কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরাও প্রতিজ্ঞা করেছি, একটা সুখবর না পাওয়া পর্যন্ত ওমুখো হব না'।

ডাক্তার হাসিয়া ব্যোমকেশকে অভিনন্দন জানাইল, কিন্তু তাহার মুখে হাসি ভাল ফুটিল না। ক্ষুধিত ব্যক্তি অন্যকে আহার করিতে দেখিলে হাসিতে পারে, কিন্তু সে হাসি আনন্দের নয়।

ব্যোমকেশ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মনের ভাব বুঝিল, পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, 'বন্ধু, মনে ক্ষোভ রাখবেন না। আপনি যা পেয়েছেন তা কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। একসঙ্গে দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য আর পরকীয়াপ্রীতির তীক্ষ্ণ স্বাদ উপভোগ করে নিচ্ছেন।'

আমি যোগ করিয়া দিলাম, 'ভেবে দেখুন, শেলী বলেছেন, হে পবন, শীত যদি আসে বসন্ত রহে কি কভু দূরে! ফুলের মরশুম শেষ হোক, ফল আপনি আসবে।'

এবার ডাক্তারের মুখে সত্যকার হাসি ফুটিল। আরও কিছুক্ষণ হাসি-তামাসার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার ঘটক, কাল রামকিশোরবাবুর বাড়িতে বিষয়-ঘটিত আলোচনা খানিকটা শুনেছিলাম, বাকিটা শোনবার কৌতূহল আছে। যদি বাধা না থাকে আপনি বলুন।'

ডাক্তার বলিল, 'বাধা কি? রামকিশোরবাবু তো লুকিয়ে কিছু করছেন না। মাসখানেক আগে ওঁর স্বাস্থ্য হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে; হৃদযন্ত্রের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন অনেকটা সামলেছেন; কিন্তু ওঁর ভয় হয়েছে হঠাৎ যদি মারা যান তাহলে বড় ছেলেরা মামলা-মোকদ্দমায় সম্পত্তি নষ্ট করবে। হয়তো নাবালক ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করবার চেষ্টা করবে। তাই বেঁচে

থাকতে থাকতেই উনি সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে চান। সম্পত্তি সমান চার ভাগ হবে; দু'ভাগ বড় দুই ছেলে পাবে, বাকি দু'ভাগ রামকিশোরের অধিকারে থাকবে। তারপর ওঁর মৃত্যু হলে গদাই আর তুলসী ওয়ারিসান্-সূত্রে ওঁর সম্পত্তি পাবে, বড় দুই ছেলে আর কিছু পাবে না।'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'বুঝেছি। দুর্গ নিয়ে কি ঝগড়া হচ্ছিল?'

'দুর্গটা রামকিশোরবাবু নিজের দখলে রেখেছেন। অথচ দুই ছেলেরই লোভ দুর্গের ওপর।'

'মণিলালকে দুর্গ দেবার কথা উঠল কেন?'

'ব্যাপার হচ্ছে এই—রামকিশোরবাবু স্থির করেছেন তুলসীর সঙ্গে মণিলালের বিয়ে দেবেন। মণিলাল ওঁর বড় মেয়েকে বিয়ে করেছিল, সে-মেয়ে মারা গেছে, জানেন বোধ হয়। কাল কথায় কথায় রামকিশোরবাবু বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর বসত-বাড়িটা পাবে গদাই, আর মণিলাল পাবে দুর্গ। মণিলাল মানেই তুলসী, মণিলালকে আলাদা কিছু দেওয়া হচ্ছে না। তাইতেই বংশী আর মুরলী ঝগড়া শুরু করে দিলে।'

'হুঁ। কিন্তু তুলসীর বিয়ের তো এখনও দেরি আছে। ওর কতই বা বয়স হবে।'

'আধুনিক মতে বিয়ের বয়স না হলেও নেহাৎ ছোট নয়, বছর তের-চোদ্দ হবে। রামকিশোরবাবু বোধহয় শিগ্‌গিরই ওদের বিয়ে দেবেন। যদি হঠাৎ মারা যান, নাবালক ছেলেমেয়েদের একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবক চাই তো! বড় দুই ছেলের ওপর ওঁর কিছুমাত্র আস্থা নেই।'

'যেটুকু দেখেছি তাতে আস্থা থাকার কথা নয়। মণিলাল মানুষটি কেমন?'

'মাথা-ঠাণ্ডা লোক। রামকিশোরবাবু তাই ওর ওপরেই ভরসা রাখেন। তবে যেভাবে শ্বশুরবাড়ি কামড়ে পড়ে আছে তাতে মনে হয় চক্ষুলজ্জা কম।'

'ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ শূন্যে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, 'ডাক্তার ঘটক, আপনি রুগী সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকবেন।'

ডাক্তার চকিত হইয়া বলিল, 'রুগী! কোন্ রুগী?'

'রামকিশোরবাবু। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র যদি দলিল রেজিস্ট্রি হবার আগেই হঠাৎ থেমে যায় তাহলে কারুর সুবিধা হ'তে পারে।'

ডাক্তার চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া রহিল।

বেলা দশটা নাগাদ ডাক্তার বিদায় লইলে আমরা মুন্‌শী আতাউল্লাকে খবর পাঠাইলাম।

আতাউল্লা লোকটি অতিশয় কেতা-দুরস্থ প্রৌঢ় মুসলমান, বোধহয় খানদানী ব্যক্তি। কৃশ দেহে ছিটের আচকান, দাড়িতে মেহদীর রঙ, চোখে সুর্মা, মুখে পান; তাহার চোস্ত্ জবানের সঙ্গে মুখ হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় পানের কুচি ছিট্‌কাইয়া পড়িত। লোকটি সজ্জন।

আমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মুন্‌শী আতাউল্লা দুইজন আর্দালির সাহায্যে ঈশানবাবুর বিছানা ও তোরঙ্গ আনিয়া আমাদের খিদ্‌মতে পেশ করিলেন। বিছানাটা নাম মাত্র। রঙ-ওঠা সতরঞ্চিতে জড়ানো জীর্ণ বাঁদিপোতার তোষক ও তেলচিটে বালিশ। তবু ব্যোমকেশ উহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। তোষকটি ঝাড়িয়া এবং বালিশটি টিপিয়া-টিপিয়া দেখিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে গুপ্ত ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব ধরা পড়িল না।

বিছানা স্থানান্তরিত করিবার হুকুম দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মুন্‌শীজী, একটা মোহর ছিল সেটা দেখতে পাওয়া যাবে কি?'

'বেশক্, জনাব। আপনার যদি মরজি হয় তাই আমি মোহর সঙ্গে এনেছি।' আতাউল্লা আচ্‌কানের পকেট হইতে একটি কাঠের কৌটা বাহির করিলেন। কৌটার গায়ে নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক অক্ষর ও চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। ভিতরে তুলার মোড়কের মধ্যে মোহর।

পাকা সোনার মোহর; আকারে আয়তনে বর্তমান কালের চাঁদির টাকার মত। ব্যোমকেশ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, 'এতে উর্দুতে কি লেখা রয়েছে পড়তে পারেন?'

আতাউল্লা ঈষৎ আহত-কণ্ঠে বলিলেন, 'উর্দু নয় জনাব, ফারসী। আসরফিতে উর্দু লেখার রেওয়াজ ছিল না। যদি ফরমাস করেন পড়ে দিতে পারি, ফারসী আমার খাস জবান।'

ব্যোমকেশ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'তাই নাকি! তাহলে পড়ে বলুন দেখি কবেকার মোহর।'

আতাউল্লা চশমা আঁটিয়া মোহরের লেখা পড়িলেন, বলিলেন, 'তারিখ নেই। লেখা আছে এই মোহর নবাব আলিবর্দি খাঁ'র আমলে ছাপা হয়েছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে জানকীরামের কালের মোহর, পরের নয়।—আচ্ছা মুন্‌শীজী, আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপনি অফিসে যান, যদি আবার দরকার হয় আপনাকে খবর পাঠাব।'

'মেহেরবানি' বলিয়া আতাউল্লা প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ তখন অধ্যাপক মহাশয়ের তোরঙ্গটি টানিয়া লইয়া বসিল। চটা-ওঠা টিনের তোরঙ্গটির মধ্যে কিন্তু এমন কিছুই পাওয়া গেল না যাহা তাঁহার মৃত্যুর কারণ-নির্দেশে সাহায্য করিতে পারে। বস্ত্রাদি নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলি দেখলে মনে হয় অধ্যাপক মহাশয় অল্পবিত্ত ছিলেন কিম্বা অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। দুইখানি পুরাতন মলাট-ছেঁড়া বই; একটি শ্যামশাস্ত্রী-সম্পাদিত কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, অন্যটি শয়র্‌-ই-মুতাক্ষরিনের ইংরেজী অনুবাদ। ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে অধ্যাপক মহাশয়ের জ্ঞানের পরিধি কতখানি বিস্তৃত ছিল, এই বই দু'খানি হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বই দু'খানির সঙ্গে একখানি চামড়া-বাঁধানো প্রাচীন খাতা। খাতাখানি বোধ হয় ত্রিশ বছরের পুরাতন; মলাট ঢল্‌ঢলে হইয়া গিয়াছে, বিবর্ণ পাতাগুলিও খসিয়া আসিতেছে। এই খাতার অত্যন্ত অগোছালোভাবে, কোথাও পেন্সিল দিয়া দু'চার পাতা, কোথাও কালি দিয়া দু'চার ছত্র লেখা রহিয়াছে। হস্তাক্ষর সুছাঁদ নয়, কিন্তু একই হাতের লেখা। যাহাদের লেখাপড়া লইয়া কাজ করিতে হয় তাহারা এইরূপ একখানি সর্বংবহা খাতা হাতের কাছে রাখে; যখন যাহা ইচ্ছা ইহাতে টুকিয়া রাখা যায়।

খাতাখানি সযত্নে লইয়া আমরা টেবিলে বসিলাম। ব্যোমকেশ একটি একটি করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল।

প্রথম দুই-তিনটি পাতা খালি। তারপর একটি পাতায় লেখা আছে—

ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

যদি মানুষের ভাষায় কথা বলিতে
পারিতেন তবে তিনি মহরমের
বাজনার ছন্দে বলিতেন—
ধনানর্জয়ধ্বম্। ধনানর্জয়ধ্বম্!

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'মহরমের বাজনার মত শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু মানে কি?'

বলিলাম, 'মানে হচ্ছে, ধন উপার্জন করহ, ধন উপার্জন করহ। তোমার ঈশানবাবু দেখছি সিনিক্ ছিলেন।'

ব্যোমকেশ লেখাটাকে আরও কিছুক্ষণ দেখিয়া পাতা উল্টাইল। পর-পৃষ্ঠায় কেবল কয়েকটি তারিখ নোট করা রহিয়াছে। ঐতিহাসিক তারিখ; কবে হিজরি অব্দ আরম্ভ হইয়াছিল, শশাঙ্ক দেবের মৃত্যুর তারিখ কি, এই সব। বোধ হয় ছাত্রদের ইতিহাস পড়াইবার জন্য নোট করিয়াছিলেন। এমনি আরও কয়েক পৃষ্ঠায় তারিখ লেখা আছে, সেগুলির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

ইহার পর আরও কয়েক পাতা শূন্য। তারপর সহসা এক দীর্ঘ রচনা শুরু হইয়াছে। তাহার আরম্ভটা এইরূপ—

'রামবিনোদের কাছে তাহার বংশের ইতিহাস শুনিলাম। সিপাহী-যুদ্ধের সময় লুঠেরাগণ বোধ হয় সঞ্চিত ধনরত্ন লইয়া যাইতে পারে নাই; অন্তত রামবিনোদের তাহাই বিশ্বাস। সে দুর্গ দেখিয়া আসিয়াছে। তাহার উচ্চাশা, যদি কোনও দিন ধনী হয় তখন ঐ দুর্গ কিনিয়া তথায় গিয়া বাস করিবে?'

অতঃপর জানকীরাম হইতে আরম্ভ করিয়া রাজারাম জয়রাম পর্যন্ত রমাপতির মুখে যেমন শুনিয়াছিলাম ঠিক তেমনি লেখা আছে, একচুল এদিক ওদিক নাই। পাঠ শেষ হইলে আমি বলিলাম, 'যাক, একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, রমাপতি মিথ্যে গল্প বলেনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গল্পটা রমাপতি ঠিকই বলেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু গল্পটা ঈশানবাবুর মৃত্যুর রাত্রে শুনেছিল তার প্রমাণ কি? দু'দিন আগেও শুনে থাকতে পারে।'

'তা—বটে। তাহলে—?'

'তাহলে কিচ্ছু না। আমি বলতে চাই যে, ও সম্ভাবনাটাকেও বাদ দেওয়া যায় না। অর্থাৎ রমাপতি সে-রাত্রে এই গল্পই শুনেছিল এবং পরদিন ভোরবেলা গল্পের বাকিটা শোনবার জন্যে ঈশানবাবুর কাছে গিয়েছিল তার কোনও প্রমাণ নেই।'

আবার কিছুক্ষণ পাতা উল্টাইবার পর এমন একটি পৃষ্ঠায় আসিয়া পৌঁছিলাম, যেখানে তীব্র কাতরোক্তির মত কয়েকটি শব্দ লেখা রহিয়াছে—

—রামবিনোদ বাঁচিয়া নাই। আমার
একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু চলিয়া গিয়াছে।
সে কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু! দুঃস্বপ্নের মত
সে-দৃশ্য আমার চোখে লাগিয়া আছে।

ব্যোমকেশ লেখাটার উপর কিছুক্ষণ দৃষ্টি স্থাপিত রাখিয়া বলিল, 'ভয়ঙ্কর মৃত্যু। স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হয় না। খোঁজ করা দরকার।' আমার মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখিয়া মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করিল, 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ ভাই, পাইলে পাইতে পার লুকানো রতন।'

খাতার সামনের দিকের লেখা এইখানেই শেষ। মনে হয় রামবিনোদের মৃত্যুর পর খাতাটি দীর্ঘকাল অব্যবহৃত পড়িয়া ছিল, হয়তো হারাইয়া গিয়াছিল। তারপর আবার যখন লেখা আরম্ভ হইয়াছে, তখন খাতার উল্টা পিঠ হইতে।

প্রথম লেখাটি কালি-কলমের লেখা; পীতবর্ণ কাগজে কালি চুপ্‌সিয়া গিয়াছে। পাতার মাথার দিকে লেখা হইয়াছে—

রামকিশোরের বড় ছেলে বংশীধর কলেজে পড়িতে আসিয়াছে।
অনেকদিন পরে উহাদের সঙ্গে আবার সংযোগ ঘটিল। সেই
রামবিনোদের মৃত্যুর পর আর খোঁজ লই নাই।

পাতার নীচের দিকে লেখা আছে—বংশীধর এক মারাত্মক
কেলেঙ্কারী করিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি।
হাজার হোক রামবিনোদের ভ্রাতুষ্পুত্র।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বংশীধরের কেলেঙ্কারীর হদিস বোধ হয় দু'চার দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এ কি!'

দেখা গেল বাকি পাতাগুলিতে যে লেখা আছে তাহার সবগুলিই লাল-নীল পেন্সিলে লেখা। ব্যোমকেশ পাতাগুলি কয়েকবার ওলট পালট করিয়া বলিল, 'অজিত, তোরঙ্গর তলায় দেখ তো লাল-নীল পেন্সিল আছে কি না।'

বেশী খুঁজিতে হইল না, একটি দু'মুখো লাল-নীল পেন্সিল পাওয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, বোঝা গেল। এর পর যা কিছু লেখা আছে ঈশানবাবু দুর্গে আসার পর লিখেছেন এগুলি তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়।'

প্রথম লেখাটি এইরূপ—

দুর্গে গুপ্তকক্ষ দেখিতে পাইলাম না।
ভারি আশ্চর্য! দুর্গের সোনাদানা কোথায় রক্ষিত হইত?
প্রকাশ্য কক্ষে রক্ষিত হইত বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়
কোথাও গুপ্তকক্ষ আছে। কিন্তু কোথায়? সিপাহীরা
গুপ্তকক্ষের সন্ধান পাইয়া থাকিলে গুপ্তকক্ষ আর গুপ্ত
থাকিত না, তাহার দ্বার ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইত, তখন
উহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইত। তবেই গুপ্তকক্ষের
সন্ধান সিপাহীরা পায় নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অধ্যাপক মহাশয়ের যুক্তিটা খুব বিচারসহ নয়। সিপাহীরা চলে যাবার পর রাজারামের পরিবারবর্গ ফিরে এসেছিল। তারা হয়তো ভাঙা তোষাখানা মেরামত করিয়েছিল, তাই এখন ধরা যাচ্ছে না।'

পাতা উল্টাইয়া ব্যোমকেশ পড়িল—

কেহ আমাকে ভয় দেখাইয়া দুর্গ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। বংশীধর? আমি কিন্তু সহজে দুর্গ ছাড়িব না! ধনানর্জয়ধ্বম্! ধনানর্জয়ধ্বম্!

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবার মহরমের বাজনা কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহরের গন্ধ পেয়ে বোধ হয় তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়েছিল।'

অতঃপর কয়েক পৃষ্ঠা পরে খাতার শেষ লেখা। আমরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। বাংলা ভাষায় লেখা নয়, উর্দু কিংবা ফারসীতে লেখা তিনটি পংক্তি। তাহার নীচে বাংলা অক্ষরে কেবল দুইটি শব্দ—মোহনলাল কে?

ব্যোমকেশ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'সত্যিই তো মোহনলাল কে? এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমাদের কর্ম নয়। ডাকো মুন্‌শী আতাউল্লাকে।'

আতাউল্লা আসিয়া লিপির পাঠোদ্ধার করিলেন। বলিলেন, 'জনাব, মৃত ব্যক্তি ভাল ফারসী জানতেন মনে হচ্ছে। তবে একটু সেকেলে ধরনের। তিনি লিখেছেন, 'যদি আমি বা জয়রাম বাঁচিয়া না থাকি আমাদের তামাম ধনসম্পত্তি সোনাদানা মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রহিল।'

'মোহনলালের জিম্মায়!'

'জি জনাব, তাই লেখা আছে।

'হুঁ। আচ্ছা মুন্‌শীজী, আপনি এবার জিনিসপত্র সব নিয়ে যান। কেবল এই খাতাটা আমার কাছে রইল।'

* * *

দু'জনে সিগারেট ধরাইয়া আরাম কেদারার কোলে অঙ্গ ছড়াইয়া দিলাম। নীরবে একটা সিগারেট শেষ করিয়া তাহারই চিতাগ্নি হইতে দ্বিতীয় সিগারেট ধরাইয়া বলিলাম, 'খাতা পড়ে কি মনে হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ কেদারার দুই হাতলে তবলা বাজাইতে বাজাইতে বলিল, 'মনে হচ্ছে, ধনানর্জয়ধ্বম্। ধনানর্জয়ধ্বম্।

'ঠাট্টা নয়, কি বুঝলে বল না।'

'পরিষ্কারভাবে কিছুই বুঝিনি এখনও। তবে ঈশানবাবুকে যদি সত্যিই কেউ হত্যা ক'রে থাকে তাহলে হত্যার একটা মোটিভ্ দেখতে পাচ্ছি।'

'কি মোটিভ্?

'সেই চিরন্তন মোটিভ্—টাকা।

'আচ্ছা, ফারসী ভাষায় ঐ কথাগুলো লিখে রাখার তাৎপর্য কি?'

'ওটা উনি নিজে লেখেননি। অর্থাৎ হস্তাক্ষর ওঁর, কিন্তু রচনা ওঁর নয়, রাজারামের। উনি লেখাটি দুর্গে কোথাও পেয়েছিলেন, তারপর খাতায় টুকে রেখেছিলেন।'

'তারপর?'

'তারপর মারা গেলেন।'

৫

পাণ্ডেজি ফিরিলেন বেলা বারোটার পর। হেল্‌মেট খুলিয়া ফেলিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন, 'কাজ হল বটে কিন্তু বুড়ো গোড়ায় গোলমাল করেছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গোলমাল কিসের?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বেলা হয়ে গেছে, খেতে বসে সব বলব। আপনি কিছু পেলেন?'

'খেতে বসে বলব।'

আহারে বসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি আগে বলুন। কাল তো রামকিশোরবাবু নিমরাজি ছিলেন, আজ হঠাৎ বেঁকে বসলেন কেন?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'কাল আমরা চলে আসবার পর কেউ ওঁকে বলেছে যে আপনি একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ। তাতেই উনি ঘাব্‌ড়ে গেছেন।'

'এতে ঘাবড়াবার কি আছে? ওঁর মনে যদি পাপ না থাকে—'

'সেই কথাই শেষ পর্যন্ত আমাকে বলতে হল। বললাম, 'হলই বা ব্যোমকেশবাবু ডিটেক্‌টিভ, আপনার ভয়টা কিসের? আপনি কি কিছু লুকোবার চেষ্টা করেছেন?' তখন বুড়ো তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেল।'

আমি বলিলাম, 'রামকিশোরবাবু তাহলে সত্যিই কিছু লুকোবার চেষ্টা করেছেন।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আমার তাই সন্দেহ হল। কিন্তু ঈশানবাবুর মৃত্যু-ঘটিত কোনো কথা নয়। অন্য কিছু। যাহোক, আমি ঠিক করে এসেছি, আজই ওরা দুর্গটাকে আপনাদের বাসের উপযোগী করে রাখবে। আপনারা ইচ্ছে করলে আজ বিকেলে যেতে পারেন কিম্বা কাল সকালে যেতে পারেন।'

'আজ বিকেলেই যাব।'

'তাই হবে। কিন্তু আমি আর একটা ব্যবস্থা করেছি। আমার খাস আরদালি সীতারাম আপনাদের সঙ্গে থাকবে।'

'না না, কি দরকার?'

'দরকার আছে। সীতারাম লাল পাগড়ী পরে যাবে না, সাধারণ

চাকর সেজে যাবে। লোকটা খুব হুঁশিয়ার; তাছাড়া ওর একটা মস্ত বিদ্যে আছে, ও সাপের রোজা। ও সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে হবে। ভেবে দেখুন, আপনাদের জল তোলা কাপড় কাচা বাসন মাজার জন্যেও তো একজন লোক দরকার। ওদের লোক না নেওয়াই ভাল।'

ব্যোমকেশ সম্মত হইল। পাণ্ডে তখন বলিলেন, 'এবার আপনার হাল বয়ান করুন।'

ব্যোমকেশ সবিস্তারে ঈশানবাবুর খাতার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিল। শুনিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'হুঁ, মোহনলাল লোকটা কে ছিল আমারও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু একশো বছর পরে আর তার ঠিকানা বার করা সম্ভব হবে না। এদিকে হালের খবর ঈশানবাবু লিখছেন, তাঁকে কেউ ভয় দেখিয়ে দুর্গ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে। তাঁর সন্দেহ বংশীধরের ওপর। কিন্তু সত্যি কথাটা কি? ভয়ই বা দেখালো কী ভাবে?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ সব প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া যাবে না। দেখা যাক, দুর্গে গিয়ে যদি দুর্গের রহস্য ভেদ করা যায়।'

অপরাহ্ণে পুলিশ ভ্যানে চড়িয়া শৈল-দুর্গে উপস্থিত হইলাম। আমরা তিনজন এবং সীতারাম। পাণ্ডেজি আমাদের ঘর-বসত করিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইবেন, সীতারাম থাকিবে। সীতারামের বয়স পঁয়ত্রিশ, লিকলিকে লম্বা গড়ন, তামাটে ফর্সা রঙ, শিকারী বিড়ালের মত গোঁফ। তাহার চেহারার মাহাত্ম্য এই যে, সে ভাল কাপড়চোপড় পরিলে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়, আবার নেংটি পরিয়া থাকিলে বাসন-মাজা ভৃত্য মনে করিতে তিল-মাত্র দ্বিধা হয় না। উপস্থিত তাহার পরিধানে হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, কাঁধে গামছা। অর্থাৎ, মোটা কাজের চাকর।

আমাদের সঙ্গে লট্‌বহর কম ছিল না, বিছানা বাক্স, চাল ডাল আনাজ প্রভৃতি রসদ, ইক্‌মিক্ কুকার এবং আরও কত কি। সীতারাম এবং বুলাকি-লাল মালপত্র দুর্গে ঢোলাই করিতে আরম্ভ করিল। পাণ্ডে বলিলেন, 'চলুন, গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা করে আসবেন।'

গৃহস্বামী বাড়ির সদর বারান্দায় উপবিষ্ট ছিলেন, সঙ্গে জামাই মণিলাল। আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন; আমরা খাবার ব্যবস্থা নিজেরাই

করিয়াছি বলিয়া অনুযোগ করিলেন; শহুরে মানুষ পাহাড়ে জঙ্গলে মন বসাইতে পারিব না বলিয়া রসিকতা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু সতর্ক ও সাবধান হইয়া রহিল।

মিষ্টালাপের সময় লক্ষ্য করিলাম, বাড়ির অন্যান্য অধিবাসীরা আমাদের শুভগমনে বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বংশীধর এবং মুরলীধর চিলের মত চক্রাকারে আমাদের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু কাছে আসিতেছে না। রমাপতি একবার বাড়ির ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া আমাদের দেখিয়া নিঃশব্দে সরিয়া গেল। নায়েব চাঁদমোহন বারান্দার অন্য প্রান্তে থেলো হুঁকোয় তামাক টানিতে টানিতে বক্র দৃষ্টিশলাকায় আমাদের বিদ্ধ করিতেছেন। তুলসী একটা জুঁই ঝাড়ের আড়াল হইতে কৌতূহলী কাঠ-বিড়ালীর মত আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল; কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম একটা থামের আড়াল হইতে সে উঁকি মারিতেছে।

ব্যোমকেশ যে একজন খ্যাতনামা গোয়েন্দা এবং কোনও গভীর অভিসন্ধি লইয়া দুর্গে বাস করিতে আসিয়াছে তাহা ইহারা জানিতে পারিয়াছে এবং তদনুযায়ী উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল গদাধরের জড়বুদ্ধি বোধ হয় এতবড় ধাক্কাতেও সক্রিয় হইয়া ওঠে নাই; তাহাকে দেখিলাম না।

আমরা গাত্রোত্থান করিলে রামকিশোরবাবু বলিলেন, 'শুধু থাকার জন্যেই এসেছেন মনে করবেন না যেন। আপনারা আমার অতিথি, যখন যা দরকার হবে খবর পাঠাবেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' আমরা গমনোদ্যত হইলাম। গৃহস্বামী ইসারা করিলেন, মণিলাল আমাদের সঙ্গে চলিল; উদ্দেশ্য দুর্গ পর্যন্ত আমাদের আগাইয়া দিয়া আসিবে।

সিঁড়ি দিয়া নামা ওঠার সময় মণিলালের সঙ্গে দুইচারিটা কথা হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি যে ডিটেকটিভ একথা রামকিশোরবাবু জানলেন কি করে?'

মণিলাল বলিল, 'আমি বলেছিলাম। আপনার নাম আমার জানা ছিল; এঁর লেখা বই পড়েছি। শুনে কর্তা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তারপর আপনারা দুর্গে এসে থাকতে চান শুনে ঘাবড়ে গেলেন।'

'কেন ?'

'এই সেদিন একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল—'

'তাই আপনাদের ভয় আমাদেরও সাপে খাবে। ভালো কথা, আপনার স্ত্রীও না সর্পঘাতে মারা গিয়েছিলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এ অঞ্চলে দেখছি খুব সাপ আছে।'

'আছে নিশ্চয়। কিন্তু আমি কখনও চোখে দেখিনি।'

দেউড়ি পর্যন্ত নামিয়া আমরা দুর্গের সিঁড়ি ধরিলাম। হঠাৎ মণিলাল জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনারা পুলিশের লোক, তাই জানতে কৌতূহল হচ্ছে —ঈশানবাবু ঠিক সাপের কামড়েই মারা গিয়েছিলেন তো ?'

ব্যোমকেশ ও পাণ্ডের মধ্যে একটা চকিত দৃষ্টি বিনিময় হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'কেন বলুন দেখি ? এ বিষয়ে সন্দেহ আছে নাকি ?'

মণিলাল ইতস্তত করিয়া বলিল, 'না—তবে—কিছুই তো বলা যায় না—'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সাপ ছাড়া আর কি হতে পারে ?'

মণিলাল বলিল, 'সেটা আমিও বুঝতে পারছি না। ঈশানবাবুর পায়ে সাপের দাঁতের দাগ আমি নিজের চোখে দেখেছি। ঠিক যেমন আমার স্ত্রীর পায়ে ছিল।' মণিলাল একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

দুর্গের তোরণে আসিয়া পৌঁছিলাম। মণিলাল বলিল, 'এবার আমি ফিরে যাব। কর্তার শরীর ভাল নয়, তাঁকে বেশীক্ষণ একলা রাখতে সাহস হয় না। কাল সকালেই আবার আসব।'

মণিলাল নমস্কার করিয়া নামিয়া গেল। সূর্য অস্ত গিয়াছিল। রামকিশোরবাবুর বাড়ির মাথার উপর শুক্লা দ্বিতীয়ার কৃশাঙ্গী চন্দ্রকলা মুচকি হাসিয়া বাড়ির আড়ালে লুকাইয়া পড়িল। আমরাও তোরণ দিয়া দুর্গের অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ সকালে ডাক্তার ঘটককে তাঁর রুগী সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলাম; এখন দেখছি তার কোনও দরকার ছিল না। সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল রেজেষ্ট্রি না হওয়া পর্যন্ত জামাই মণিলাল যক্ষের মত শ্বশুরকে আগলে থাকবে।'

পাণ্ডে একটু হাসিলেন, 'হ্যাঁ—ঈশানবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে এদের খটকা লেগেছে দেখছি। কিন্তু এখন কিছু বলা হবে না।'

'না।'

আমরা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। পাণ্ডেজির হাতে একটি মুষলাকৃতি লম্বা টর্চ ছিল; সেটির বৈদ্যুতিক আলো যেমন দূরপ্রসারী, প্রয়োজন হইলে সেটিকে মারাত্মক প্রহরণরূপেও ব্যবহার করা চলে। পাণ্ডে টর্চ জ্বালিয়া তাহার আলো সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন, 'এটা আপনাদের কাছে রেখে যাব, দরকার হতে পারে। চলুন, দেখি আপনাদের থাকার কি ব্যবস্থা হয়েছে।'

দেখা গেল সেই গজাল-কণ্টকিত ঘরটিতেই থাকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। দুইটি লোহার খাট, টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আসবাব দেওয়ালের নিরাভরণ দৈন্য অনেকটা চাপা দিয়াছে। সীতারাম ইতিমধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়াছে, বিছানা পাতিয়াছে, ইক্‌মিক্‌ কুকারে রান্না চড়াইয়াছে এবং ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল গরম করিতেছে। তাহার কর্মতৎপরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম।

অচিরাৎ ধূমায়মান চা আসিয়া উপস্থিত হইল। চায়ে চুমুক দিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'সীতারাম, কেমন দেখলে?'

সীতারাম বলিল, 'কিল্লা ঘুরে দেখে নিয়েছি হুজুর। এখানে সাপ নেই।'

নিঃসংশয় উক্তি। পাণ্ডে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

'আর কিছু?'

'আর, সিঁড়ি ছাড়া কিল্লায় ঢোকবার অন্য রাস্তা নেই। দেয়ালের বাইরে খাড়া পাহাড়।

ব্যোমকেশ পাণ্ডের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'এর মানে বুঝতে পারছেন?

'কি?'

'যদি কোনও আততায়ী দুর্গে ঢুকতে চায় তাকে সিঁড়ি দিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ দেউড়ির পাশ দিয়ে আসতে হবে। বুলাকিলাল তাকে দেখে ফেলতে পারে।'

'হুঁ, ঠিক বলেছেন। বুলাকিলালকে জেরা করতে হবে। কিন্তু আজ

দেরি হয়ে গেছে, আজ আর নয়।—সীতারাম তোমাকে বেশী বলবার দরকার নেই। এঁদের দেখাশুনা করবে, আর চোখ কান খুলে রাখবে।'

'জী হুজুর।'

পাণ্ডেজি উঠিলেন।

'কাল কোনও সময়ে আসব। আপনারা সাবধানে থাকবেন।'

পাণ্ডেজিকে দুর্গতোরণ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলাম। ব্যোমকেশ টর্চ জ্বালিয়া সিঁড়ির উপর আলো ফেলিল, পাণ্ডে নামিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে নীচে হইতে শব্দ পাইলাম পুলিশ ভ্যান্ চলিয়া গেল। ওদিকে রাম কিশোরবাবুর বাড়িতে তখন মিটিমিটি আলো জ্বলিয়াছে।

আমরা আবার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আকাশে তারা ফুটিয়াছে, জঙ্গলের দিক হইতে মিষ্ট বাতাস দিতেছে। সীতারাম যেন আমাদের মনের অকথিত অভিলাষ জানিতে পারিয়া দুটি চেয়ার আনিয়া অঙ্গনে রাখিয়াছে। আমরা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উপবেশন করিলাম।

এই নক্ষত্রবিদ্ধ অন্ধকারে বসিয়া আমার মন নানা বিচিত্র কল্পনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা যেন রূপকথার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। সেই যে রাজপুত্র কোটালপুত্র কি জানি কিসের সন্ধানে বাহির হইয়া ঘুমন্ত রাজকুমারীর মায়াপুরীতে উপনীত হইয়াছিল, আমাদের অবস্থা যেন সেইরূপ। অবশ্য ঘুমন্ত রাজকুমারী নাই, কিন্তু সাপের মণি আছে কিনা কে বলিতে পারে? কোন্ অদৃশ্য রাক্ষস-রাক্ষসীরা তাহাকে পাহারা দিতেছে তাহাই বা কে জানে? শুক্তির অভ্যন্তরে মুক্তার ন্যায় কোন অপরূপ রহস্য এই প্রাচীর দুর্গের অস্থিপঞ্জরতলে লুক্কায়িত আছে?

ব্যোমকেশ ফস্ করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া আমার রোম্যান্টিক স্বপ্নজাল ভাঙিয়া দিল। সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'ঈশানবাবু ঠিক ধরেছিলেন দুর্গে নিশ্চয় কোথাও গুপ্ত তোষাখানা আছে।'

বলিলাম, 'কিন্তু কোথায়? এতবড় দুর্গের মাটি খুঁড়ে তার সন্ধান বার করা কি সহজ?'

'সহজ নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস ঈশানবাবু সন্ধান পেয়েছিলেন; তাঁর মুঠির মধ্যে মোহরের আর কোনও মানে হয় না।'

কথাটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিয়া শেষে বলিলাম, 'তা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে আরও অনেক মোহুর আছে।'

'সম্ভব। এবং তার চেয়েও বড় কথা, ঈশানবাবু যখন খুঁজে বার করতে পেরেছেন তখন আমরাও পারব।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া অন্ধকারে পায়চারী করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পায়চারী করিবার পর সে হঠাৎ 'উ' বলিয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে কোনক্রমে সামলাইয়া লইল। আমি লাফাইয়া উঠিলাম—'কি হল।'

'কিছু নয়, সামান্য হোঁচট খেয়েছি।' টর্চটা তাহার হাতেই ছিল, সে তাহা জ্বালিয়া মাটিতে আলো ফেলিল।

দিনের আলোতে যাহা চোখে পড়ে নাই, এখন তাহা সহজে চোখে পড়িল। একটা চৌকশ পাথর সম্প্রতি কেহ খুঁড়িয়া তুলিয়াছিল, আবার অপটু হস্তে যথাস্থানে বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। পাথরটা সমানভাবে বসে নাই, একদিকের কানা একটু উঁচু হইয়া আছে। ব্যোমকেশ অন্ধকারে ওই উঁচু কানায় পা লাগিয়া হোঁচট খাইয়াছিল।

আল্‌গা পাথরটা দেখিয়া আমি উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম,—'ব্যোমকেশ! পাথরের তলায় তোষাখানার গর্ত নেই তো?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'উঁহু, পাথরটা বড় জোর চৌদ্দ ইঞ্চি চৌকশ। ওর তলায় যদি গর্ত থাকেও, তা দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারবে না।'

'তবু—'

'না হে, যা ভাবছ তা নয়। খোলা উঠোনে তোষখানার গুপ্তদ্বার হতে পারে না। যা হোক, কাল সকালে পাথর তুলিয়ে দেখতে হবে।'

ব্যোমকেশ টর্চ ঘুরাইয়া চারিদিকে আলো ফেলিল, কিন্তু অন্য কোথাও পাথরের পাটি নাড়াচাড়া হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। অদূরে কামানটা পড়িয়া আছে, তাহার নীচে অনেক ধূলামাটি জমিয়া কামানকে মেঝের সঙ্গে জাম করিয়া দিয়াছে; সেখানেও আল্‌গা মাটি বা পাথর চোখে পড়িল না।

এই সময় সীতারাম আসিয়া জানাইল, আহার প্রস্তুত। হাতের ঘড়িতে দেখিলাম পৌনে দশটা। কখন যে নিঃসাড়ে সময় কাটিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই।

ঘরে গিয়া আহারে বসিলাম। ইক্‌মিক্‌ কুকারের রাঁধা খিচুড়ি এবং মাংস যে এমন অমৃততুল্য হইতে পারে তাহা জানা ছিল না। তার উপর সীতারাম অমলেট ভাজিয়াছে। গুরুভোজন হইয়া গেল।

আমাদের ভোজন শেষ হইলে সীতারাম বারান্দায় নিজের আহার সারিয়া লইল। দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'হুজুর, যদি হুকুম হয় একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ তো। তুমি শোবে কোথায়?'

সীতারাম বলিল, 'সেজন্যে ভাববেন না হুজুর। আমি দোরের বাইরে বিছানা পেতে শুয়ে থাকব।'

সীতারাম চলিয়া গেল। আমরা আলো কমাইয়া দিয়া বিছানায় লম্বা হইলাম। দ্বার খোলাই রহিল; কারণ ঘরে জানালা নাই, দ্বার বন্ধ করিলে দম বন্ধ হইবার সম্ভাবনা।

শুইয়া শুইয়া বোধহয় তন্দ্রা আসিয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশের গলার আওয়াজে সচেতন হইয়া উঠিলাম, 'ছাখো, ঐ গজালগুলো আমার ভাল ঠেকছে না।'

'গজাল! কোন্ গজাল?'

'দেয়ালে এত গজাল কেন? পাণ্ডেজি একটা কৈফিয়ৎ দিলেন বটে, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।'

এত রাত্রে গজালকে সন্দেহ করার কোনও মানে হয় না। ঘড়িতে দেখিলাম এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সীতারাম এখনও এদিক ওদিক দেখিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

'আজ ঘুমোও, কাল গজালের কথা ভেবো।' বলিয়া আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

৬

গভীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ মাথার শিয়রে বোমা ফাটার মত শব্দে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মুহূর্তের জন্য কোথায় আছি ঠাহর করিতে পারিলাম না।

স্থানকালের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম ব্যোমকেশ দ্বারের বাহিরে টর্চের আলো ফেলিয়াছে, সেখানে কতকগুলো ভাঙা হাঁড়ি কলসীর মত খোলামকুচি পড়িয়া আছে। তারপর ব্যোমকেশ জ্বলন্ত টর্চ হাতে লইয়া তীরবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 'অজিত, এসো—'

আমিও আলুথালুভাবে উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম ; সে কাহারও পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে কিম্বা বিপদের ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার হাতের আলোটা যেদিকে যাইতেছে, আমিও সেইদিকে ছুটিলাম।

তোরণের মুখে পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ সিঁড়ির উপর আলো ফেলিল। আমি তাহার কাছে পৌছিয়া দেখিলাম, সিঁড়ি দিয়া একটা লোক ছুটিতে ছুটিতে উপরে আসিতেছে। কাছে আসিলে চিনিলাম—সীতারাম।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'সীতারাম, সিঁড়ি দিয়ে কাউকে নামতে দেখেছ ?'

সীতারাম বলিল, 'জী হুজুর, আমি ওপরে আসছিলাম, হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে টক্কর লেগে গেল। আমি তাকে ধরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু লোকটা হাত ছাড়িয়ে পালাল।'

'তাকে চিনতে পারলে ?'

'জী না, অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাইনি। কিন্তু টক্কর লাগবার সময় তার মুখ দিয়ে একটা বুরা জবান বেরিয়ে গিয়েছিল, তা শুনে মনে হল লোকটা ছোট জাতের হিন্দুস্থানী।—কিন্তু কী হয়েছে হুজুর ?'

'তা এখনও ঠিক জানি না। দেখবে এস।'

ফিরিয়া গেলাম। ঘরের সম্মুখে ভাঙা হাঁড়ির টুকরাগুলা পড়িয়া ছিল, ব্যোমকেশ বলিল, 'ঐ ত্যাখো। আমি জেগেছিলাম, বাইরে খুব হাল্‌কা

পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভাবলাম, তুমি বুঝি ফিরে এলে। তারপরই দুম্ করে শব্দ—'

সীতারাম ভাঙা সরার মত একটা টুকরা তুলিয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিল। বলিল, 'হুজুর, চট করে খাটের ওপর উঠে বসুন।'

'কেন? কি ব্যাপার?'

'সাপ। কেউ সরা-ঢাকা হাঁড়িতে সাপ এনে এইখানে হাঁড়ি আছড়ে ভেঙ্গেছে। আমাকে টর্চ দিন, আমি খুঁজে দেখছি। সাপ কাছেই কোথাও আছে।'

আমরা বিলম্ব না করিয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিলাম, কারণ অন্ধকার রাত্রে সাপের সঙ্গে বীরত্ব চলে না। সীতারাম টর্চ লইয়া বাহিরে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল।

লণ্ঠনটা উস্কাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবুকে কিসের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা হয়েছিল এখন বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু লোকটা কে?'

'তা এখন বলা শক্ত। বুলাকিলাল হতে পারে, গণপৎ হতে পারে, এমন কি সন্নিসি ঠাকুরও হতে পারেন।'

এই সময় সীতারামের আকস্মিক অট্টহাস্য শুনিতে পাইলাম। সীতারাম গলা চড়াইয়া ডাকিল, 'হুজুর, এদিকে দেখবেন আসুন। কোনও ভয় নেই।

সন্তর্পণে নামিয়া সীতারামের কাছে গেলাম। বাড়ির একটা কোণ আশ্রয় করিয়া বাদামী রঙের একটা সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া কিল্‌বিল্ করি-তেছে। সাপটা আহত, তাই পলাইতে পারিতেছে না, তীব্র আলোর তলায় তাল পাকাইতেছে।

সীতারাম হাসিয়া বলিল, 'ঢাম্‌না সাপ, হুজুর, বিষ নেই। মনে হচ্ছে কেউ আমাদের সঙ্গে দিল্‌লাগি করেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দিল্‌লাগিই বটে। কিন্তু এখন সাপটাকে নিয়ে কি করা যাবে?'

'আমি ব্যবস্থা করছি।' সীতারাম খাবার ঢাকা দিবার ছিদ্রযুক্ত পিতলের

ঢাক্‌নি আনিয়া সাপটাকে চাপা দিল, বলিল, 'আজ এমনি থাক, কাল দেখা যাবে।'

আমরা ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। সীতারাম দ্বারের সম্মুখে নিজের বিছানা পাতিতে প্রবৃত্ত হইল। রাত্রি ঠিক দ্বিপ্রহর।

ব্যোমকেশ বলিল, 'সীতারাম, তুমি এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলে, কি করছিলে এবার বল দেখি।'

সীতারাম বলিল, 'হুজুর, এখান থেকে নেমে দেউড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি, বুলাকিলাল ভাঙ্‌ খেয়ে নিজের কুঠুরীর মধ্যে ঘুমুচ্ছে। তার কাছ থেকে কিছু খবর বার করবার ইচ্ছে ছিল, সন্ধ্যাবেলা তার সঙ্গে দোস্তী করে রেখেছিলাম। ঠেলাঠুলি দিলাম কিন্তু বুলাকিলাল জাগল না। কি করি, ভাবলাম, যাই সাধুবাবার দর্শন করে আসি।'

'সাধুবাবা জেগে ছিলেন, আমাকে দেখে খুসী হলেন। আমাকে অনেক সওয়াল করলেন; আপনারা কে, কি জন্যে এসেছেন, এইসব জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আপনারা হাওয়া বদল করতে এসেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ। আর কি কথা হল?'

সীতারাম বলিল, 'অনেক আজে-বাজে কথা হল হুজুর। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একেবারে প্রফেসার সাহেবের মৃত্যুর কথা তুললাম, তাতে সাধুবাবা ভীষণ চটে উঠলেন। দেখলাম, বাড়ির মালিক আর নায়েববাবুর ওপর ভারি রাগ। বার বার বলতে লাগলেন, ওদের সর্বনাশ হবে, ওদের সর্বনাশ হবে।'

'তাই নাকি! ভারি অকৃতজ্ঞ সাধু দেখছি। তারপর?'

'তারপর সাধুবাবা এক ছিলিম গাঁজা চড়ালেন। আমাকে প্রসাদ দিলেন।'

'তুমি গাঁজা খেলে?'

'জী হুজুর। সাধুবাবার প্রসাদ তো ফেলে দেওয়া যায় না।'

'তা বটে। তারপর?'

'তারপর সাধুবাবা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমিও চলে এলাম। ফেরবার সময় সিঁড়িতে ঐ লোকটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, একটা কথা বল তো সীতারাম। তুমি যখন ফিরে আসছিলে তখন বুলাকিলালকে দেখেছিলে ?'

সীতারাম বলিল, 'না হুজুর, চোখে দেখিনি। কিন্তু দেউড়ির পাশ দিয়ে আসবার সময় কুঠুরী থেকে তার নাকডাকার ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ শুনেছিলাম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাপের হাঁড়ি নিয়ে যিনি এসেছিলেন তিনি আর যেই হোন, বুলাকিলাল কিম্বা সাধুবাবা নন। আশা করি, তিনি আজ আর দ্বিতীয়বার এদিকে আসবেন না—এবার ঘুমিয়ে পড়।'

* * * *

সকালে উঠিয়া দেখা গেল ঢাক্‌নি-চাপা সাপটা রাত্রে মরিয়া গিয়াছে ; বোধহয় হাঁড়ি ভাঙার সময় গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল। সীতারাম সেটাকে লাঠির ডগায় তুলিয়া দুর্গপ্রাকারের বাহিরে ফেলিয়া দিল। আমরাও প্রাকারে উঠিয়া একটা চক্র দিলাম। দেখা গেল, প্রাকার একেবারে অটুট নয় বটে কিন্তু তোরণদ্বার ছাড়া দুর্গে প্রবেশ করিবার অন্য কোনও চোরাপথ নাই। প্রাকারের নীচেই অগাধ গভীরতা।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় সীতারামকে দুর্গে রাখিয়া ব্যোমকেশ ও আমি রামকিশোরবাবুর বাড়িতে গেলাম। রমাপতি সদর বারান্দায় আমাদের অভ্যর্থনা করিল।—'আসুন। কর্তা এখনি বেরুচ্ছেন, শহরে যাবেন।'

'তাই নাকি!' আমরা ইতস্তত করিতেছি এমন সময় রামকিশোরবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। পরনে গরদের পাঞ্জাবি, গলায় কোঁচানো চাদর ; আমাদের দেখিয়া বলিলেন, 'এই যে!—নতুন জায়গা কেমন লাগছে ? রাত্রে বেশ আরামে ছিলেন ? কোনও রকম অসুবিধে হয়নি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কোনও অসুবিধে হয়নি, ভারি আরামে রাত কেটেছে। আপনি বেরুচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ, একবার উকিলের বাড়ি যাব, কিছু দলিলপত্তর রেজিস্ট্রি করাতে হবে। তা—আপনারা এসেছেন, আমি না হয় একটু দেরি করেই যাব—

ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, আপনি কাজে বেরুচ্ছেন বেরিয়ে পড়ুন। আমরা এমনি বেড়াতে এসেছি, কোনও দরকার নেই।'

'তা—আচ্ছা। রমাপতি, এঁদের চা-টা দাও। আমাদের ফিরতে বিকেল হবে।'

রামকিশোর বাহির হইয়া পড়িলেন ; জামাই মণিলাল এক বস্তা কাগজ-পত্র লইয়া সঙ্গে গেল। আমাদের পাশ দিয়া যাইবার সময় মণিলাল সহাস্য-মুখে নমস্কার করিল।

ব্যোমকেশ রমাপতিকে বলিল, 'চায়ের দরকার নেই, আমরা চা খেয়ে বেরিয়েছি। আজই বুঝি সম্পত্তি বাঁটোয়ারার দলিল রেজিষ্ট্রি হবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ?'

'যাক, একটা দুর্ভাবনা মিট্‌ল।—আচ্ছা, বলুন দেখি—'

রমাপতি হাতজোড় করিয়া বলিল, 'আমাকে 'আপনি' বলবেন না, 'তুমি' বলুন।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বেশ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে কিন্তু সে পরে হবে। এখন বল দেখি গণপৎ কোথায়?'

রমাপতি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'গণপৎ—মুরলীদার চাকর? বাড়িতেই আছে নিশ্চয়। আজ সকালে তাকে দেখিনি। ডেকে আনব?'

এই সময় মুরলীধর বারান্দায় আসিয়া আমাদের দেখিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। তাহার ট্যারা চোখ আরও ট্যারা হইয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিই মুরলীধরবাবু? নমস্কার। আপনার চাকর গণপৎকে একবার ডেকে দেবেন? তার সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

মুরলীধরের মুখ ভয় ও বিদ্রোহের মিশ্রণে অপরূপ ভাব ধারণ করিল। সে চেরা গলায় বলিল, 'গণপতের সঙ্গে কি দরকার?'

'তাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'সে—তাকে ছুটি দিয়েছি। সে বাড়ি গেছে।'

'তাই নাকি? কবে ছুটি দিয়েছেন?'

'কাল—কাল দুপুরে।' মুরলীধর আর প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আমরা পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। রমাপতির মুখে একটা ত্রস্ত উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। সে ব্যোমকেশের কাছে সরিয়া আসিয়া

খাটো গলায় বলিল, 'কাল দুপুরে—! কিন্তু কাল সন্ধ্যের পরও আমি গণপৎকে বাড়িতে দেখেছি—'

ঘাড় নাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'খুব সম্ভব। কারণ, রাত বারোটা পর্যন্ত গণপৎ বাড়ি যায়নি। কিন্তু সে যাক। নায়েব চাঁদমোহনবাবু বাড়িতে আছেন নিশ্চয়। আমরা তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

রমাপতি বলিল, 'তিনি নিজের ঘরে আছেন—'

'বেশ, সেখানেই আমাদের নিয়ে চল।'

বাড়ির এক কোণে চাঁদমোহনের ঘর। আমরা দ্বারের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া সারি সারি কলিকায় তামাক সাজিয়া রাখিতেছেন, বোধ করি সারাদিনের কাজ সকালেই সারিয়া লইতেছেন। ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া রমাপতিকে বিদায় করিল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম, ব্যোমকেশ দরজা ভেজাইয়া দিল।

আমাদের অতর্কিত আবির্ভাবে চাঁদমোহন ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার চতুর চোখে চকিত ভয়ের ছায়া পড়িল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'কে? অ্যাঁ—ও—আপনারা—!'

ব্যোমকেশ তক্তপোশের কোণে বসিয়া বলিল, 'চাঁদমোহনবাবু, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।' তাহার কণ্ঠস্বর খুব মোলায়েম শুনাইল না।

ত্রাসের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া চাঁদমোহন গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'কি কথা?'

'অনেক দিনের পুরোনো কথা। রামবিনোদের মৃত্যু হয় কি করে?'

চাঁদমোহনের মুখ শীর্ণ হইয়া গেল, তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'আমি কিছু বলতে পারি না—আমি এ বাড়ির নায়েব—'

ব্যোমকেশ গম্ভীর স্বরে বলিল, চাঁদমোহনবাবু, আপনি আমার নাম জানেন; আমার কাছে কোনও কথা লুকোবার চেষ্টা করলে তার ফল ভাল হয় না। রামবিনোদের মৃত্যুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। কি করে তাঁর মৃত্যু হল সব কথা খুলে বলুন।'

চাঁদমোহন ব্যোমকেশের দিকে একটা তীক্ষ্ণ চোরা চাহনি হানিয়া ধীরে ধীরে তক্তপোশের একপাশে আসিয়া বসিলেন, শুষ্কস্বরে বলিলেন, 'আপনি যখন জোর করছেন তখন না বলে আমার উপায় নেই। আমি যতটুকু জানি বলছি।'

ভিজা গামছায় মুখ মুছিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'১৯১১ সালের শীতকালে আমরা মুঙ্গেরে ছিলাম। রামবিনোদ আর রামকিশোরের তখন ঘিয়ের ব্যবসা ছিল, কলকাতায় ঘি চালান দিত। মুঙ্গেরে মস্ত ঘিয়ের আড়ং ছিল। আমি ছিলাম কর্মচারী, আড়তে বসতাম। ওরা দুই ভাই যাওয়া আসা করত।

'হঠাৎ একদিন মুঙ্গেরে প্লেগ দেখা দিল। মানুষ মরে উড়কুড়্ উঠে যেতে লাগল, যারা বেঁচে রইল তারা ঘর-দোর ফেলে পালাতে লাগল। শহর শূন্য হয়ে গেল। রামবিনোদ আর রামকিশোর তখন মুঙ্গেরে, তারা বড় মুশকিলে পড়ল। আড়তে ষাট-সত্তর হাজার টাকার মাল রয়েছে, ফেলে পালানো যায় না; হয়তো সব চোরে নিয়ে যাবে। আমরা তিনজনে পরামর্শ করে স্থির করলাম, গঙ্গার বুকে নৌকা ভাড়া করে থাকব, আর পালা করে রোজ একজন এসে আড়ৎ তদারক করে যাব। তারপর কপালে যা আছে তাই হবে। একটা সুবিধে ছিল, আড়ৎ গঙ্গার থেকে বেশী দূরে নয়।

'রামবিনোদের এক ছেলেবেলার বন্ধু মুঙ্গেরে ইস্কুল মাস্টারি করত—ঈশান মজুমদার। ঈশান সেদিন সর্পাঘাতে মারা গেছে। সেও নৌকায় এসে জুটল। মাঝি মাল্লা নেই, শুধু আমরা চারজন—নৌকোটা বেশ বড় ছিল; নৌকোতেই রান্নাবান্না, নৌকোতেই থাকা। গঙ্গার মাঝখানে চড়া পড়েছিল, কখনও সেখানে গিয়ে রাত কাটাতাম। শহরের সঙ্গে সম্পর্কে ছিল কেবল দিনে একবার গিয়ে আড়ৎ দেখে আসা।

'এইভাবে দশ বারো দিন কেটে গেল। তারপর একদিন রামবিনোদকে প্লেগে ধরল। শহরে গিয়েছিল, জ্বর নিয়ে ফিরে এল। আমরা চড়ায় গিয়ে নৌকো লাগালাম, রামবিনোদকে চড়ায় নামালাম। একে তো প্লেগের কোনও চিকিৎসা নেই, তার ওপর মাঝগঙ্গায় কোথায় ওষুধ, কোথায় ডাক্তার। রামবিনোদ পরের দিনই মারা গেল।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'তারপর আপনারা কি করলেন?'

চাঁদমোহন বলিলেন, 'আর থাকতে সাহস হল না। আড়তের মায়া ত্যাগ করে নৌকো ভাসিয়ে ভাগলপুরে পালিয়ে এলাম।'

'রামবিনোদের দেহ সৎকার করেছিলেন?'

চাঁদমোহন গামছায় মুখ মুছিয়া বলিলেন, 'দাহ করবার উপকরণ ছিল না; দেহ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

* * * *

'চল এবার ফেরা যাক। এখানকার কাজ আপাতত শেষ হয়েছে।'

সিঁড়ির দিকে যাইতে যাইতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি মনে হল? চাঁদমোহন সত্যি কথা বলেছে?'

'একটু মিথ্যে বলেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই।'

সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইব, দেখিলাম তুলসী অদূরে একটি গাছের ছায়ায় খেলাঘর পাতিয়াছে, একাকিনী খেলায় এমন মগ্ন হইয়া গিয়াছে যে আমাদের লক্ষ্যই করিল না। ব্যোমকেশ কাছে গিয়া দাঁড়াইতে সে বিস্ফারিত চক্ষু তুলিয়া চাহিল। ব্যোমকেশ একটু সস্নেহ হাসিয়া বলিল, 'তোমার নাম তুলসী, না? কি মিষ্টি তোমার মুখখানি!'

তুলসী তেমনি অপলক চক্ষে চাহিয়া রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা দুর্গে আছি, তুমি আসো না কেন? এসো—অনেক গল্প বলব।'

তুলসী তেমনি তাকাইয়া রহিল, উত্তর দিল না। আমরা চলিয়া আসিলাম।

৭

দুর্গে ফিরিয়া কিছুক্ষণ সিঁড়ি ওঠা-নামার ক্লান্তি দূর করিলাম। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবু দলিল রেজিস্ট্রি করতে গেলেন। যদি হয়ে যায়, তাহলে ওদের বাড়িতে একটা নাড়াচাড়া তোলাপাড়া হবে; বংশী আর মুরলীধর হয়তো শহরে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে চাইবে। তার আগেই এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার।'

প্রশ্ন করিলাম, 'ব্যোমকেশ, কিছু বুঝছ? আমি তো যতই দেখছি, ততই জট পাকিয়ে যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা আবছায়া চলচ্চিত্রের ছবি মনের পর্দায় ফুটে উঠছে। ছবিটা ছোট নয়; অনেক মানুষ অনেক ঘটনা অনেক সংঘাত জড়িয়ে তার রূপ। একশো বছর আগে এই নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছিল, এখনও শেষ হয়নি।—ভাল কথা, কাল রাত্রের আলগা পাথরটার কথা মনে ছিল না। চল, দেখি গিয়ে তার তলায় গর্ত আছে কিনা।'

'চল।'

পাথরটার উপর অল্প-অল্প চুন সুরকি জমাট হইয়া আছে, আশেপাশের পাথরগুলির মত মসৃণ নয়। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'মনে হচ্ছে পাথরটাকে তুলে আবার উল্টো করে বসানো হয়েছে। এসো, তুলে দেখা যাক।'

আমরা আঙুল দিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পাথর উঠিল না। তখন সীতারামকে ডাকা হইল। সীতারাম করিতকর্মা লোক, সে একটা খুন্তি আনিয়া চাড়া দিয়া পাথর তুলিয়া ফেলিল।

পাথরের নীচে গর্তটর্ত কিছু নাই, ভরাট চুন সুরকি। ব্যোমকেশ পাথরের উল্টা পিঠ পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'ওহে, এই ছাখো, উর্দু-ফারসী লেখা রয়েছে!'

দেখিলাম পাথরের উপর কয়েক পংক্তি বিজাতীয় লিপি খোদাই করা রহিয়াছে। খোদাই খুব গভীর নয়, উপরন্তু লেখার উপর ধূলাবালি জমিয়া প্রায় অলক্ষণীয় হইয়া পড়িয়াছে। ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, 'আমার মনে হচ্ছে—। দাঁড়াও, ঈশানবাবুর খাতাটা নিয়ে আসি।'

ঈশানবাবুর খাতা ব্যোমকেশ নিজের কাছে রাখিয়াছিল। সে তাহা আনিয়া যে-পাতায় ফারসী লেখা ছিল, তাহার সহিত পাথরের উৎকীর্ণ লেখাটা মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। আমিও দেখলাম। অর্থবোধ হইল না বটে, কিন্তু দুটি লেখার টান যে একই রকম তাহা সহজেই চোখে পড়ে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়েছে। এবার চল।'

পাথরটি আবার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা ঘরে আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার বুঝলে?'

'তুমি পরিষ্কার করে বল।'

'একশ বছর আগের কথা স্মরণ কর। সিপাহীরা আসছে শুনে রাজারাম তাঁর পরিবারবর্গেকে সরিয়ে দিলেন, দুর্গে রইলেন কেবল তিনি আর জয়রাম। তারপর বাপবেটায় সমস্ত ধনরত্ন লুকিয়ে ফেললেন।

'কিন্তু সোনাদানা লুকিয়ে রাখার পর রাজারামের ভয় হল, সিপাহীদের হাতে তাঁরা যদি মারা পড়েন, তাহলে তাঁদের স্ত্রী-পরিবার সম্পত্তি উদ্ধার করবে কি করে? তিনি পাথরের ওপর সঙ্কেত-লিপি লিখলেন; এমন ভাষায় লিখলেন যা সকলের আয়ত্ত নয়। তারপর ধুলোকাদা দিয়ে লেখাটা অস্পষ্ট করে দিলেন, যাতে সহজে সিপাহীদের নজরে না পড়ে।

'সিপাহীরা এসে কিছুই খুঁজে পেল না। রাগে তারা বাপবেটাকে হত্যা করে চলে গেল। তারপর রাজারামের পরিবারবর্গ যখন ফিরে এল, তারাও খুঁজে পেল না রাজারাম কোথায় তাঁর ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে গেছেন। পাথরের পাটিতে খোদাই করা ফারসী সঙ্কেত-লিপি কারুর চোখে পড়ল না।'

বলিলাম, 'তাহলে তোমার বিশ্বাস, রাজারামের ধনরত্ন এখনও দুর্গে লুকোনো আছে?'

'তাই মনে হয়। তবে সিপাহীরা যদি রাজারাম আর জয়রামকে যন্ত্রণা দিয়ে গুপ্তস্থানের সন্ধান বার করে নিয়ে থাকে তাহলে কিছুই নেই।'

'তারপর বল।'

'তারপর একশ বছর পরে এলেন অধ্যাপক ঈশান মজুমদার। ইতিহাসের পণ্ডিত, ফারসী-জানা লোক; তার ওপর বন্ধু রামবিনোদের কাছে দুর্গের ইতিবৃত্ত শুনেছিলেন। তিনি সন্ধান করতে আরম্ভ করলেন; প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। তাঁর এই গুপ্ত অনুসন্ধান কতদূর এগিয়েছিল জানি না, কিন্তু একটি জিনিস তিনি পেয়েছিলেন—ঐ পাথরে খোদাই করা সঙ্কেত-লিপি। তিনি সযত্নে তার নকল খাতায় টুকে রেখেছিলেন, আর পাথরটাকে উল্টে বসিয়েছিলেন, যাতে আর কেউ না দেখতে পায়। তারপর—তারপর যে কী হল সেইটেই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।'

ব্যোমকেশ খাটের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া উর্ধ্বে চাহিয়া রহিল। আমিও আপন মনে এলোমেলো চিন্তা করিতে লাগিলাম। পাণ্ডেজি এবেলা বোধহয় আসিলেন না...কলিকাতায় সত্যবতীর খবর কি···ব্যোমকেশ হঠাৎ তুলসীর

সহিত এমন সস্নেহে কথা বলিল কেন? মেয়েটার চৌদ্দ বছর বয়স, দেখিলে মনে হয় দশ বছরেরটি...

দ্বারের কাছে ছায়া পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, তুলসী আর গদাধর। তুলসীর চোখে শঙ্কা ও আগ্রহ, বোধহয় একা আসিতে সাহস করে নাই, তাই গদাধরকে সঙ্গে আনিয়াছে। গদাধরের কিন্তু লেশমাত্র শঙ্কা-সঙ্কোচ নাই; তাহার হাতে লাট্টু, মুখে কান-এঁটো-করা হাসি। আমাকে দেখিয়া হাস্য সহকারে বলিল, 'হে হে জামাইবাবুর সঙ্গে তুলসীর বিয়ে হবে—হে হে হে—'

তুলসী বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া তাহার গালে একটি চড় বসাইয়া দিল। গদাধর ক্ষণেক গাল ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর গম্ভীরমুখে লাট্টুতে লেত্তি পাকাইতে পাকাইতে প্রস্থান করিল। বুঝিলাম ছোট বোনের হাতে চড়-চাপড় খাইতে সে অভ্যস্ত।

তুলসীকে ব্যোমকেশ আদর করিয়া ঘরের মধ্যে আহ্বান করিল, তুলসী কিন্তু আসিতে চায় না, দ্বারের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যোমকেশ তখন তাহাকে হাত ধরিয়া আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল।

তবু তুলসীর ভয় ভাঙে না, ব্যাধশঙ্কিতা হরিণীর মত তার ভাবভঙ্গী। ব্যোমকেশ নরম স্বরে সমবয়স্কের মত তাহার সহিত গল্প করিতে আরম্ভ করিল। দুটা হাসি তামাসার কথা, মেয়েদের খেলাধূলা পুতুলের বিয়ে প্রভৃতি মজার কাহিনী,—শুনিতে শুনিতে তুলসীর ভয় ভাঙিল। প্রথমে দু' একবার 'হুঁ' 'না,' তারপর সহজভাবে কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট পনরোর মধ্যে তুলসীর সঙ্গে আমাদের সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। দেখিলাম তাহার মন সরল, বুদ্ধি সতেজ; কেবল তাহার স্নায়ু সুস্থ নয়; সামান্য কারণে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া সহজতার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। ব্যোমকেশ তাহার চরিত্র ঠিক ধরিয়াছিল, তাই সস্নেহ ব্যবহারে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে।

তুলসীর সহিত আমাদের যে সকল কথা হইল, তাহা আগাগোড়া পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই; তাহাদের পরিবার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানা গেল যাহা পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাকিগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে এসে যিনি ছিলেন, তোমার বাবার বন্ধু ঈশানবাবু, তাঁর সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছিল?'

তুলসী বলিল, 'হ্যাঁ। তিনি আমাকে কত গল্প বলতেন। রাত্তিরে তাঁর ঘুম হত না; আমি অনেক বার দুপুর রাত্তিরে এসে তাঁর কাছে গল্প শুনেছি।'

'তাই নাকি! তিনি যে-রাত্তিরে মারা যান সে-রাত্তিরে তুমি কোথায় ছিলে?'

'সে-রাত্তিরে আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

'ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল! সেকি!'

'হ্যাঁ। আমি যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই কিনা, তাই ওরা সুবিধে পেলেই আমাকে বন্ধ করে রাখে।'

'ওরা কারা?'

'সবাই। বাবা বড়দা মেজদা জামাইবাবু—'

'সে-রাত্তিরে কে তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল?'

'বাবা।'

'হুঁ। আর কাল রাত্রে বুঝি মেজদা তোমাকে ঘরে বন্ধ করেছিল?'

'হ্যাঁ—তুমি কি করে জানলে?'

'আমি সব জানতে পারি। আচ্ছা, আর একটা কথা বল দেখি। তোমার বড়দার বিয়ে হয়েছিল, বৌদিদিকে মনে আছে?'

'কেন থাকবে না? বৌদিদি খুব সুন্দর ছিল। দিদি তাকে ভারি হিংসে করত।'

'তাই নাকি! তা তোমার বৌদিদি আত্মহত্যা করল কেন?'

'তা জানি না। সে-রাত্তিরে দিদি আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

'ও—'

ব্যোমকেশ আমার সহিত একটা দৃষ্টি বিনিময় করিল। কিছুক্ষণ অন্য কথার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা তুলসী, বল দেখি বাড়ির মধ্যে তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসো?'

তুলসী নিঃসঙ্কোচে অলজ্জিত মুখে বলিল, 'মাস্টার মশাইকে। উনিও আমাকে খুব ভালবাসেন।'

'আর মণিলালকে তুমি ভালবাসো না?'

তুলসীর চোখ দুটা যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল;—'না। ও কেন মাস্টার মশাইকে হিংসে করে! ও কেন মাস্টার মশায়ের নামে বাবার কাছে লাগায়? ও যদি আমাকে বিয়ে করে আমি ওকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেব!' বলিয়া তুলসী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমরা দুই বন্ধু পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বেচারি!'

আধ ঘণ্টা পরে স্নানের জন্য উঠি-উঠি করিতেছি, রমাপতি আসিয়া দ্বারে উঁকি মারিল, কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'তুলসী এদিকে এসেছিল না কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, এই খানিকক্ষণ হল চলে গেছে। এস—বোসো।'

রমাপতি সঙ্কুচিতভাবে আসিয়া বসিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'রমাপতি, প্রথম যেদিন আমরা এখানে আসি, তুমি বলেছিলে এবার ঈশানবাবুর মৃত্যু-সমস্যার সমাধান হবে। অর্থাৎ তুমি মনে কর ঈশানবাবুর মৃত্যুর একটা সমস্যা আছে। কেমন?'

রমাপতি চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'ধরে নেওয়া যাক ঈশানবাবুর মৃত্যুটা রহস্যময়, কেউ তাকে খুন করেছে। এখন আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, তুমি তার সোজাসুজি উত্তর দাও। সঙ্কোচ কোরো না! মনে কর তুমি আদালতে হলফ্ নিয়ে সাক্ষী দিচ্ছ।'

রমাপতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বাড়ির সকলকেই তুমি ভাল করে চেনো। বল দেখি, ওদের মধ্যে এমন কে আছে যে মানুষ খুন করতে পারে?'

রমাপতি সভয়ে কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'আমার বলা উচিত নয়, আমি ওঁদের আশ্রিত। কিন্তু অবস্থায় পড়লে বোধহয় সবাই মানুষ খুন করতে পারেন।'

'সবাই? রামকিশোরবাবু?'

'হ্যাঁ।'

'বংশীধর?'

'হ্যাঁ।'

'মুরলীধর?'

'হ্যাঁ। ওঁদের প্রকৃতি বড় উগ্র—'

'নায়েব চাঁদমোহন?'

'বোধহয় না। তবে কর্তার হুকুম পেলে লোক লাগিয়ে খুন করাতে পারেন।'

'মণিলাল?'

রামপতির মুখ অন্ধকার হইল, সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'নিজের হাতে মানুষ খুন করবার সাহস ওঁর নেই। উনি কেবল চুক্‌লি খেয়ে মানুষের অনিষ্ট করতে পারেন।'

'আর তুমি? তুমি মানুষ খুন করতে পার না?'

'আমি—!'

'আচ্ছা, যাক।—তুমি টর্চ চুরি করেছিলে?'

রমাপতি তিক্তমুখে বলিল, 'আমার বদনাম হয়েছে জানি। কে বদনাম দিয়েছে তাও জানি। কিন্তু আপনিই বলুন, যদি চুরিই করতে হয়, একটা সামান্য টর্চ চুরি করব!'

'অর্থাৎ চুরি করনি।--যাক, মণিলালের সঙ্গে তুলসীর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে তুমি জানো?'

রমাপতির মুখ কঠিন হইয়া উঠিল কিন্তু সে সংযতভাবে বলিল, 'জানি। কর্তার তাই ইচ্ছে।'

'আর কারুর ইচ্ছে নয়?'

'না।'

'তোমারও ইচ্ছে নয়?'

রমাপতি উঠিয়া দাঁড়াইল,—'আমি একটা গলগ্রহ, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় কী আসে যায়। কিন্তু এ বিয়ে যদি হয়, একটা বিশ্রী কাণ্ড হবে।' বলিয়া আমাদের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'ছোকরার সাহস আছে!'

বৈকালে সীতারাম চা লইয়া আসিলে ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল, 'সীতারাম, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। বছর দুই আগে একদল বেদে এসে এখানে তাঁবু ফেলে ছিল। তোমাকে বুলাকিলালের কাছে খবর নিতে হবে, বাড়ির কে কে বেদের তাঁবুতে যাতায়াত করত—এ বিষয়ে যত খবর পাও যোগাড় করবে।'

সীতারাম বলিল, 'জি হুজুর। বুলাকিলাল এখন বাবুদের নিয়ে শহরে গেছে, ফিরে এলে খোঁজ নেব।'

সীতারাম প্রস্থান করিলে বলিলাম, 'বেদে সম্বন্ধে কৌতূহল কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিষ! সাপের বিষ কোত্থেকে এল খোঁজ নিতে হবে না?'

'ও—'

এই সময় পাণ্ডেজি উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কাঁধ হইতে চামড়ার ফিতায় বাইনাকুলার ঝুলিতেছে; ব্যোমকেশ বলিল, 'একি; দূরবীন কি হবে?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আনলাম আপনার জন্যে, যদি কাজে লাগে।—সকালে আসতে পারিনি, কাজে আটকে পড়েছিলাম। তাই এবেলা সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় আসতে আসতে দেখি রামকিশোরবাবুরাও শহর থেকে ফিরছেন। তাঁদের ইঞ্জিন বিগড়েছে, বুলাকিলাল হুইল ধরে বসে আছে, রামকিশোরবাবু গাড়ির মধ্যে বসে আছেন, আর জামাই মণিলাল গাড়ি ঠেলছে।'

'তারপর?'

'দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়ি টেনে নিয়ে এলাম।'

'ওঁদের আদালতের কাজকর্ম চুকে গেল?'

'না, একটু বাকি আছে, কাল আবার যাবেন।—তারপর, নতুন খবর কিছু আছে নাকি?'

'অনেক নতুন খবর আছে।'

খবর শুনিতে শুনিতে পাণ্ডেজি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বিবৃতি শেষ হইলে বলিলেন, 'আর সন্দেহ নেই। ঈশানবাবু তোষাখানা খুঁজে বার করেছিলেন, তাই তাঁকে কেউ খুন করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে খুন করতে পারে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'রামকিশোরবাবু থেকে সন্নিসি ঠাকুর পর্যন্ত সবাই খুন করতে পারে। কিন্তু এটাই একমাত্র প্রশ্ন নয়। আরও প্রশ্ন আছে।'

'যেমন?'

'যেমন, বিষ এল কোত্থেকে। সাপের বিষ তো যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। তারপর ধরুন, সাপের বিষ শরীরে ঢোকাবার জন্যে এমন একটা যন্ত্র চাই যেটা ঠিক সাপের দাঁতের মত দাগ রেখে যায়।'

'হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ—'

'ইন্‌জেকশানের ছুঁচের দাগ খুব ছোট হয়, দু'চার মিনিটের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। আপনি ঈশানবাবুর পায়ে দাগ দেখেছেন, ইন্‌জেকশানের দাগ বলে মনে হয় কি?'

'উঁহু। তাছাড়া দুটো দাগ পাশাপাশি—'

'ওটা কিছু নয়। যেখানে রুগী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে সেখানে পাশাপাশি দু'বার ছুঁচ ফোটানো শক্ত কি?'

'তা বটে।—আর কি প্রশ্ন?'

'আর, ঈশানবাবু যদি গুপ্ত তোষাখানা খুঁজে বার করে থাকেন তবে সে তোষাখানা কোথায়?'

'এই দুর্গের মধ্যেই নিশ্চয়ই আছে।'

'শুধু দুর্গের মধ্যেই নয়, এই বাড়ির মধ্যেই আছে। মুরলীধর যে সাপের ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়াবার চেষ্টা করছে, তার কারণ কি?'

পাণ্ডেজি তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিলেন, 'মুরলীধর?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তার অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মোট কথা ঈশানবাবু আসবার আগে তোষাখানার সন্ধান কেউ জানত না। তারপর ঈশানবাবু ছাড়া আর একজন জানতে পেয়েছে এবং ঈশানবাবুকে খুন করেছে। তবে আমার বিশ্বাস, মাল সরাতে পারেনি।'

'কি করে বুঝলেন ?'

'দেখুন, আমরা দুর্গে আছি, এটা কারুর পছন্দ নয়। এর অর্থ কি ?'

'বুঝেছি। তাহলে আগে তোষাখানা খুঁজে বার করা দরকার। কোথায় তোষাখানা থাকতে পারে ; আপনি কিছু ভেবে দেখেছেন কি ?'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, বলিল, 'কাল থেকে একটা সন্দেহ আমার মনের মধ্যে ঘুরছে—'

আমি বলিলাম, 'গজাল !'

এই সময় সীতারাম চায়ের পাত্রগুলি সরাইয়া লইতে আসিল। ব্যোমকেশ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, 'বুলাকিলাল ফিরে এসেছে।'

সীতারাম মাথা ঝুঁকাইয়া পাত্রগুলি লইয়া চলিয়া গেল। পাণ্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওকে কোথাও পাঠালেন নাকি ?'

'হ্যাঁ, বুলাকিলালের কাছে কিছু দরকার আছে।'

'যাক। এবার আপনার সন্দেহের কথা বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঐ গজালগুলো। কেবল সন্দেহ হচ্ছে ওদের প্রকাশ্য প্রয়োজনটাই একমাত্র প্রয়োজন নয়, যাকে বলে ধোঁকার টাটি, ওরা হচ্ছে তাই।'

পাণ্ডে গজালগুলিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, 'হুঁ। তা কি করা যেতে পারে ?'

'আমার ইচ্ছে ওদের একটু নেড়েচেড়ে দেখা। আপনি এসেছেন, আপনার সামনেই যা কিছু করা ভাল। যদি তোষাখানা বেরোয়, আমরা তিনজনে জানব, আর কাউকে আপাতত জানতে দেওয়া হবে না।—অজিত, দরজা বন্ধ কর।'

দরজা বন্ধ করিলে ঘর অন্ধকার হইল। তখন লণ্ঠন জ্বালিয়া এবং টর্চের আলো ফেলিয়া আমরা অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। সর্বশুদ্ধ পনরোটি গজাল আমরা প্রত্যেকটি টানিয়া ঠেলিয়া উঁচু দিকে আকর্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। গজালগুলি মরিচা-ধরা, কিন্তু বজ্রের মত দৃঢ়, একচুলও নড়িল না।

হঠাৎ পাণ্ডে বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে ! নড়ছে—একটু একটু নড়ছে—!' আমরা ছুটিয়া তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। দরজার সামনে যে

দেয়াল, তাহার মাঝখানে একটা গজাল। পাণ্ডে গজাল ধরিয়া ভিতর দিকে ঠেলা দিতেছেন, নড়িতেছে কিনা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পাণ্ডে বলিলেন, 'আমার একার কর্ম নয়। ব্যোমকেশবাবু, আপনিও ঠেলুন।'

ব্যোমকেশ হাঁটু গাড়িয়া দুই হাতে পাথরে ঠেলা দিতে শুরু করিল। চতুষ্কোণ পাথর ধীরে ধীরে পিছন দিকে সরিতে লাগিল। তাহার নীচে অন্ধকার গর্ত দেখা গেল।

আমি টর্চের আলো ফেলিলাম। গর্তটি লম্বা-চওড়ায় দুই হাত, ভিতরে একপ্রস্থ সরু সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে।

পাণ্ডে মহা উত্তেজিতভাবে কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন, 'সাবাস! পাওয়া গেছে তোষাখানা।—ব্যোমকেশবাবু, আপনি আবিষ্কর্তা, আপনি আগে ঢুকুন।'

টর্চ লইয়া ব্যোমকেশ আগে নামিল, তারপর পাণ্ডেজি, সর্বশেষে লণ্ঠন লইয়া আমি। ঘরটি উপরের ঘরের মতই প্রশস্ত। একটি দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া সারি সারি মাটির কুণ্ডা, কুণ্ডার মুখে ছোট ছোট হাঁড়ি, হাঁড়ির মুখ সরা দিয়া ঢাকা। ঘরের অন্য কোণে একটি বড় উনান, তাহার সহিত একটি হাপরের নল সংযুক্ত রহিয়াছে। হাপরের চামড়া অবশ্য শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কিন্তু কাঠামো দেখিয়া হাপর বলিয়া চেনা যায়। ঘরে আর কিছু নাই।

আমাদের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল, পেট মোটা কুণ্ডাগুলিতে না জানি কোন্ রাজার সম্পত্তি সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু আগে ঘরের অন্যান্য স্থান দেখা দরকার। এদিক-ওদিক আলো ফেলিতে এককোণে একটা চকচকে জিনিস চোখে পড়িল। ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখি—একটি ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ। তুলিয়া লইয়া জ্বালাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু টর্চ জ্বালাই ছিল, জ্বালিয়া জ্বালিয়া সেল ফুরাইয়া নিভিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবু যে এ ঘরের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার অকাট্য প্রমাণ।'

তখন আমরা হাঁড়িগুলি খুলিয়া দেখিলাম। সব হাঁড়িই শূন্য, কেবল একটি হাঁড়ির তলায় নুনের মত খানিকটা গুঁড়া পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশ একখামচা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিল, তারপর রুমালে বাঁধিয়া

পকেটে রাখিল। বলিল, 'মুন হতে পারে, চূণ হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে।'

অতঃপর কুণ্ডাগুলি একে একে পরীক্ষা করা হইল। কিন্তু হায়, সাত রাজার ধন মিলিল না। সব কুণ্ডা খালি, কোথাও একটা কপর্দক পর্যন্ত নাই।

আমরা ফ্যাল ফ্যাল চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলাম। তারপর ঘরটিতে আঁতিপাঁতি করা হইল, কিন্তু কিছু মিলিল না।

উপরে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে গুপ্তদ্বার টানিয়া বন্ধ করা হইল। তারপর ঘরের দরজা খুলিলাম। বাহিরে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; সীতারাম দ্বারের বাহিরে ঘোরাঘুরি করিতেছে। ব্যোমকেশ ক্লান্তস্বরে বলিল, 'সীতারাম, আর একদফা চা তৈরি কর।'

চেয়ার লইয়া তিনজনে বাহিরে বসিলাম। পাণ্ডে দমিয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন, 'কি হল বলুন দেখি? মাল গেল কোথায়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনটে সম্ভাবনা রয়েছে। এক, সিপাহীরা সব লুটে নিয়ে গিয়েছে। দুই, ঈশানবাবুকে যে খুন করেছে, সে সেই রাত্রেই মাল সরিয়েছে। তিন, রাজারাম অন্য কোথাও মাল লুকিয়েছেন।'

'কোন্ সম্ভাবনাটা আপনার বেশী মনে লাগে?'

ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া 'বলাকা' কবিতার শেষ পংক্তি আবৃত্তি করিল, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথ', অন্য কোনখানে।'

চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বুলাকিলালের দেখা পেলে?'

সীতারাম বলিল, 'জী। গাড়ির ইঞ্জিন মেরামত করছিল, দু'চারটে কথা হল।'

'কি বললে সে?'

'হুজুর, বুলাকিলাল একটা আস্ত বুদ্ধু। সন্ধ্যে হলেই ভাঙ খেয়ে বেদম ঘুমোয়, রাত্তিরের কোনও খবরই রাখে না। তবে দিনের বেলা বাড়ির সকলেই বেদের তাঁবুতে যাতায়াত করত। এমন কি, বুলাকিলালও দু'চারবার গিয়েছিল।'

বুলাকিলাল গিয়েছিল কেন?'

'হাত দেখাতে। বেদেনীরা নাকি ভাল হাত দেখতে জানে, ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে। বুলাকিলালকে বলেছে ও শিগ্‌গির লাট সাহেবের মোটর ড্রাইভার হবে।'

'বাড়ির আর কে কে যেতো?'

'মালিক, মালিকের দুই বড় ছেলে, জামাইবাবু, নায়েববাবু, সবাই যেতো আর ছোট ছেলেমেয়ে দুটো সর্বদাই ওখানে ঘোরাঘুরি করত।'

'হুঁ, আর কিছু?'

'আর কিছু নয় হুজুর।'

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া পাণ্ডেজি উঠিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে রুমালে বাঁধা পুঁটুলি দিয়া বলিল, 'এটার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস্‌ করিয়ে দেখবেন। আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু খবর সংগ্রহ করেছি তাতে নিরাশ হবার কিছু নেই। অন্তত ঈশানবাবুকে যে হত্যা করা হয়েছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, বাকি খবর ক্রমে পাওয়া যাবে।'

পাণ্ডেজি রুমালের পুঁটুলি পকেটে রাখিতে গিয়া বলিলেন, 'আরে, ডাকে আপনার একটা চিঠি এসেছিল, সেটা এতক্ষণ দিতেই ভুলে গেছি। এই নিন—আচ্ছা, কাল আবার আসব।'

পাণ্ডেজিকে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ চিঠি খুলিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সত্যবতীর চিঠি নাকি?'

'না, সুকুমারের চিঠি।'

'কি খবর?'

'নতুন খবর কিছু নেই। তবে সব ভাল।'

৯

রাত্রিটা নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল।

পরদিন সকালে ব্যোমকেশ ঈশানবাবুর খাতা লইয়া বসিল। কখনও খাতাটা পড়িতেছে, কখনও উর্ধ্বপানে চোখ তুলিয়া নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়িতেছে। কথাবার্তা বলিতেছে না।

বাইনাকুলার কাল পাণ্ডেজি রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলাম, ‘কিসের গবেষণা হচ্ছে?’

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে বলিল, ‘মোহনলাল।’

মোহনলালের নামে আজ, কেন জানি না, বহুদিন পূর্বে পঠিত ‘পলাশীর যুদ্ধ’ মনে পড়িয়া গেল। বলিলাম, ‘আবার আবার সেই কামান গর্জন... কাঁপাইয়া গঙ্গাজল—’

ব্যোমকেশ ভর্ৎসনা-ভরা চক্ষু তুলিয়া আমার পানে চাহিল। আমি বলিলাম, ‘দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন, গর্জিল মোহনলাল নিকট শমন।’

ব্যোমকেশের চোখের ভর্ৎসনা ক্রমে হিংস্র ভাব ধারণ করিতেছে দেখিয়া আমি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। কেহ যদি বীররসাত্মক কাব্য সহ্য করিতে না পারে, তাহার উপর জুলুম করা উচিত নয়।

বাহিরে স্বর্ণোজ্জ্বল হৈমন্ত প্রভাত। দূরবীনটা হাতেই ছিল, আমি সেটা লইয়া প্রাকারে উঠিলাম। চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। দূরের পর্বত-চূড়া কাছে আসিয়াছে, বনানীর মাথার উপর আলোর ঢেউ খেলিতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে রামকিশোরবাবুর বাড়ির সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাড়ির খুঁটিনাটি সমস্ত দেখিতে পাইতেছি। রামকিশোর শহরে যাইবার জন্য বাহির হইলেন, সঙ্গে দুই পুত্র এবং জামাই। তাঁহারা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পরে মোটর চলিয়া গেল।... বাড়িতে রহিল মাষ্টার রমাপতি, গদাধর আর তুলসী।

ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ তখনও জলপানরত মুরগীর মত একবার কোলের দিকে ঝুঁকিয়া খাতা পড়িতেছে, আবার উঁচু দিকে মুখ তুলিয়া আপন মনে বিজ্ বিজ্ করিতেছে। বলিলাম, ‘ওহে, রামকিশোরবাবুরা শহরে চলে গেলেন।’

ব্যোমকেশ আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মুরগীর মত জলপান করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ বলিল, ‘মোহনলাল মস্ত বীর ছিল—না?’

‘সেই রকম তো শুনতে পাই।’

ব্যোমকেশ আর কথা কহিল না। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল,

সে আজ খাতা ছাড়িয়া উঠিবে না; সকালবেলাটা নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটিয়া যাইবে ভাবিয়া বলিলাম, 'চল না, সাধু-দর্শন করা যাক। তিনি হয়তো হাত গুণতে জানেন।'

অন্যমনস্কভাবে চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন নয়, ওবেলা দেখা যাবে।'

দুপুরবেলা শয্যায় শুইয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। রামকিশোরবাবু ঠিক বলিয়াছিলেন; এই নির্জনে দুদিন বাস করিলে প্রাণ পালাই-পালাই করে।

পৌনে তিনটা পর্যন্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া আর পারা গেল না, উঠিয়া পড়িলাম। দেখি, ব্যোমকেশ ঘরে নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সে প্রাকারের উপর উঠিয়া পায়চারি করিতেছে। রৌদ্র তেমন কড়া নয় বটে, কিন্তু এ সময় প্রাকারের উপর বায়ু সেবনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল না। তবু হয়তো নূতন কিছু আবিষ্কার করিয়াছে ভাবিয়া আমিও সেই দিকে চলিলাম।

আমাকে দেখিয়া সে যেন নিজের মনের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল, যন্ত্রবৎ বলিল, 'একটা তুরপুন চাই।'

'তুরপুন!' দেখিলাম, তাহার চোখে অধীর বিভ্রান্ত দৃষ্টি। এ-দৃষ্টি আমার অপরিচিত নয়, সে কিছু পাইয়াছে। বলিলাম, 'কি পেলে?'

ব্যোমকেশ এবার সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া আমাকে দেখিতে পাইল, ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, 'না না, কিছু না। তুমি দিব্যি ঘুমুচ্ছিলে, ভাবলাম এখানে এসে দূরবীনের সাহায্যে নিসর্গ-শোভা নিরীক্ষণ করি। তা দেখবার কিছু নেই।—এই নাও, তুমি ছাখো।'

প্রাকারের আলিসার উপর দূরবীনটা রাখা ছিল, সেটা আমাকে ধরাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ নামিয়া গেল। আমি একটু অবাক হইলাম। ব্যোমকেশের আজ এ কী ভাব!

চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। আতপ্ত বাতাসে বহিঃপ্রকৃতি ঝিম ঝিম করিতেছে। দূরবীন চোখে দিলাম; দূরবীন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া রামকিশোর-বাবুর বাড়ির উপর স্থির হইল।

দূরবীন দিয়া দেখার সহিত আড়ি পাতার একটা সাদৃশ্য আছে; এ যেন

চোখ দিয়া আড়ি পাতা। রামকিশোরবাবুর বাড়িটা দূরবীনের ভিতর দিয়া আমার দশ হাতের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে; বাড়ির সবই আমি দেখিতে পাইতেছি, অথচ আমাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না।

বাড়ির সদরে কেহ নাই, কিন্তু দরজা খোলা। দূরবীন উপরে উঠিল। হাঁটু পর্যন্ত আলিসা-ঘেরা ছাদ, সিঁড়ি পিছন দিকে। রমাপতি আলিসার উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশের ভাগ দেখিতে পাইতেছি। ছাদে আর কেহ নাই; রমাপতি কপাল কুঁচকাইয়া কি যেন ভাবিতেছে।

রমাপতি চমকিয়া মুখ তুলিল। সিঁড়ি দিয়া তুলসী উঠিয়া আসিল, তাহার মুখে-চোখে গোপনতার উত্তেজনা। লঘু দ্রুতপদে রমাপতির কাছে আসিয়া সে আঁচলের ভিতর হইতে ডান হাত বাহির করিয়া দেখাইল। হাতে কি একটা রহিয়াছে, কালো রঙের পেন্সিল কিম্বা ফাউন্টেন পেন।

দূরবীনের ভিতর দিয়া দেখিতেছি, কিন্তু কিছু শুনিতে পাইতেছি না; যেন সে-কালের নির্ব্বাক চলচ্চিত্র। রমাপতি উত্তেজিত হইয়া কি বলিতেছে, হাত নাড়িতেছে। তুলসী তাহার গলা জড়াইয়া অনুনয় করিতেছে, কালো জিনিসটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে—

এই সময় রঙ্গমঞ্চে আরও কয়েকটি অভিনেতার আর্বিভাব হইল। রামকিশোরবাবু সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার পিছনে বংশীধর ও মুরলীধর; সর্বশেষে মণিলাল।

সকলেই ক্রুদ্ধ; রমাপতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কাঠ হইয়া রহিল। বংশীধর বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া তুলসীকে তাড়না করিল এবং কালো জিনিসটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। তুলসী কিছুক্ষণ সতেজ তর্ক করিল, তারপর কাঁদো-কাঁদো মুখে নামিয়া গেল। তখন রমাপতিকে ঘিরিয়া বাকি কয়জন তর্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন, কেবল মণিলাল কটমট চক্ষে চাহিয়া অধরোষ্ঠ সম্বদ্ধ করিয়া রাখিল।

বংশীধর সহসা রমাপতির গালে একটা চড় মারিল। রামকিশোর বাধা দিলেন, তারপর আদেশের ভঙ্গীতে সিঁড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। সকলে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

এই বিচিত্র দৃশ্যের অর্থ কি, সংলাপের অভাবে তাহা নির্ধারণ করা

অসম্ভব। আমি আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু নাটকীয় ব্যাপার আর কিছু দেখিতে পাইলাম না; যাহা কিছু ঘটিল বাড়ির মধ্যে আমার চক্ষুর অন্তরালে ঘটিল।

নামিয়া আসিয়া ব্যোমকেশকে বলিলাম। সে গভীর মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবুরা তাহলে সদর থেকে ফিরে এসেছেন। —তুলসীর হাতে জিনিসটা চিনতে পারলে না?'

'মনে হল ফাউন্টেন পেন।'

'দেখা যাক, হয়তো শীগ্‌গিরই খবর পাওয়া যাবে। রমাপতি আসতে পারে।'

রমাপতি আসিল না, আসিল তুলসী। ঝড়ের আগে শুষ্ক পাতার মত সে যেন উড়িতে উড়িতে আসিয়া আমাদের ঘরের চৌকাঠে আটকাইয়া গেল। তাহার মূর্তি পাগলিনীর মত, দুই চক্ষু রাঙা টকটক করিতেছে। সে খাটের উপর ব্যোমকেশকে উপবিষ্ট দেখিয়া ছুটিয়া তাহার কোলের উপর আছড়াইয়া পড়িল, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আমার মাস্টারমশাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তাড়িয়ে দিয়েছে?'

তুলসীর কান্না থামানো সহজ হইল না। যাহোক, ব্যোমকেশের সস্নেহ সান্ত্বনায় কান্না ক্রমে ফোঁপানিতে নামিল, তখন প্রকৃত তথ্য জানা গেল।

জামাইবাবুর দুইটি ফাউন্টেন পেন আছে; একটি তাঁহার নিজের, অন্যটি তিনি বিবাহের সময় যৌতুক পাইয়াছিলেন...জামাইবাবু দুইটি কলম লইয়া কি করিবেন? তাই আজ তুলসী জামাইবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁহার দেরাজ হইতে মাস্টার মশাইকে দিতে গিয়াছিল—মাস্টার মশায়ের একটিও কলম নাই—মাস্টার মশাই কিন্তু লইতে চান নাই, রাগ করিয়া কলম যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে হুকুম দিয়াছিলেন। এমন সময় বাড়ির সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মাস্টার মশাইকে চোর বলিয়া ধরিল...তুলসী এত বলিল, মাস্টার মশাই চুরি করেন নাই কিন্তু কেহ শুনিল না। শেষ পর্যন্ত মারধর করিয়া মাস্টার মশাইকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে।

আমি দূরবীনের ভিতর দিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহার সহিত তুলসীর

কাহিনীর কোথাও গরমিল নাই। আমরা দুইজনে মিলিয়া তুলসীকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম, মাস্টার আবার ফিরিয়া আসিবে, কোনও ভাবনা নাই; প্রয়োজন হইলে আমরা গিয়া তুলসীর বাবাকে বলিব—

দ্বারের কাছে গলা খাঁকারির শব্দ শুনিয়া চকিতে ফিরিয়া দেখি, জামাই মণিলাল দাঁড়াইয়া আছে। তুলসী তাহাকে দেখিয়া তীরের মত তাহার পাশ কাটাইয়া অদৃশ্য হইল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন মণিবাবু।'

মণিলাল ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'কর্তা পাঠিয়েছিলেন তুলসীর খোঁজ নেবার জন্যে। ও ভারি দুরন্ত, আপনাদের বেশী বিরক্ত করে না তো?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোটেই বিরক্ত করে না। ওর মাস্টারকে নাকি তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই বলতে এসেছিল।'

মণিলাল একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, বলিল, 'হ্যাঁ, রমাপতিকে কর্তা বিদেয় করে দিলেন। আমরা কেউ বাড়িতে ছিলাম না, পরচাবি দিয়ে আমার দেরাজ খুলে একটা কলম চুরি করেছিল। দামী কলম—'

ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া বলিল, 'যে কলমটা আপনার বুক পকেটে রয়েছে ঐটে কি?'

'হ্যাঁ।' মণিলাল কলম ব্যোমকেশের হাতে দিল।

পার্কারের কলম, দামী জিনিস। ব্যোমকেশ কলম ভালবাসে, সে তাহার মাথার ক্যাপ খুলিয়া দেখিল, পিছন খুলিয়া কালি ভরিবার যন্ত্র দেখিল; তারপর কলম ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'ভাল কলম। চুরি করতে হলে এই রকম কলমই চুরি করা উচিত। বাড়িতে আর কার ফাউন্টেন পেন আছে?'

মণিলাল বলিল, 'আর কারুর নেই। বাড়িতে পড়ালেখার বিশেষ রেওয়াজ নেই। কেবল কর্তা দোয়াত কলমে লেখেন।'

'হুঁ। তুলসী বলছে ও নিজেই আপনার দেরাজ থেকে কলম বার করেছিল—'

মণিলাল দুঃখিত ভাবে বলিল, 'তুলসী মিথ্যে কথা বলছে। রমাপতির ও দোষ বরাবরই আছে। এই সেদিন একটা ইলেক্ট্রিক টর্চ—'

আমি বলিতে গেলাম, 'ইলেকট্রিক টর্চ তো—'

কিন্তু আমি কথা শেষ করিবার পূর্বে ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'ইলেকট্রিক টর্চ একটা তুচ্ছ জিনিস। রমাপতি হাজার হোক বুদ্ধিমান লোক, সে কি একটা টর্চ চুরি করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে?'

মণিলাল কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনার কথায় আমার ধোঁকা লাগছে, কি জানি যদি সে টর্চ না চুরি করে থাকে। কিন্তু আজ আমার কলমটা—। তবে কি তুলসী সত্যিই—!'

আমি জোর দিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ, তুলসী সত্যি কথা বলেছে। আমি—'

ব্যোমকেশ আবার আমার মুখে থাবা দিয়া বলিল, 'মণিলালবাবু, আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারে আমাদের মাথা গলানো উচিত নয়। আমরা দু' দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি, কি দরকার আমাদের ওসব কথায়! আপনারা যা ভাল বুঝেছেন করেছেন।'

'তাহলেও—কারুর নামে মিথ্যে বদনাম দেওয়া ভাল নয়—' বলিতে বলিতে মণিলাল দ্বারের দিকে পা বাড়াইল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ আপনাদের সদরের কাজ হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, সকাল সকাল কাজ হয়ে গেল। কেবল দস্তখৎ করা বাকি ছিল।'

'যাক, এখন তাহলে নিশ্চিন্ত।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মণিলাল প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ দরজায় উঁকি মারিয়া আসিয়া বলিল, 'আর একটু হলেই দিয়েছিলে সব ফাঁসিয়ে!'

'সে কি। কী ফাঁসিয়ে দিয়েছিলাম!'

'প্রথমে তুমি বলতে যাচ্ছিলে যে হারানো টর্চ পাওয়া গেছে।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর বলতে যাচ্ছিলে যে, দুরবীন দিয়ে ছাদের দৃশ্য দেখেছ!'

'হ্যাঁ, তাতে কী ক্ষতি হত?'

'মণিলালকে কোনও কথা বলা মানেই বাড়ির সকলকে বলা। গর্দভচর্মাবৃত যে সিংহটিকে আমরা খুঁজছি সে জানতে পারত যে আমরা তোষাখানার সন্ধান পেয়েছি এবং দুরবীন দিয়ে ওদের ওপর অষ্টপ্রহর নজর রেখেছি। শিকার ভড়্‌কে যেত না?'

এ কথাটা ভাবিয়া দেখি নাই।

এই সময় সীতারাম চা লইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডেজি আসিলেন। তিনি আমাদের জন্য অনেক তাজা খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছেন। সীতারাম সেগুলো মোটর হইতে আনিতে গেল। আমরা চা পান করিতে করিতে সংবাদের আদান-প্রদান করিলাম।

আমাদের সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'জাল থেকে মাছ বেরিয়ে যাচ্ছে। আজ রমাপতি গিয়েছে, কাল বংশীধর আর মুরলীধর যাবে। তাড়াতাড়ি জাল গুটিয়ে ফেলা দরকার।—হ্যাঁ, বংশীধর কলেজ হোস্টেলে থাকতে যে কুকীর্তি করেছিল তার খবর পাওয়া গেছে।'

'কি কুকীর্তি করেছিল?'

'একটি ছেলের সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়, তারপর মিটমাট হয়ে যায়। বংশীধর কিন্তু মনে মনে রাগ পুষে রেখেছিল; দোলের দিন সিদ্ধির সঙ্গে ছেলেটাকে ধুতরোর বিচি খাইয়ে দিয়েছিল। ছেলেটা মরেই যেত, অতি কষ্টে বেঁচে গেল।'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'হুঁ। তাহলে বিষ প্রয়োগের অভ্যাস বংশীধরের আছে।

'তা আছে। শুধু গোঁয়ার নয়, রাগ পুষে রাখে।'

পাঁচটা বাজিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন, আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে একটু আলাপ করে আসা যাক।'

১০

দেউড়ি পর্যন্ত নামিবার পর দেখিলাম বাড়ির দিকের সিঁড়ি দিয়া বংশীধর গট্‌গট্ করিয়া নামিয়া আসিতেছে। আমাদের দেখিতে পাইয়া তাহার সতেজ গতিভঙ্গী কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গেল; কিন্তু সে থামিল না, যেন শহরের রাস্তা ধরিবে এমনিভাবে আমাদের পিছনে রাখিয়া আগাইয়া গেল।

ব্যোমকেশ চুপি চুপি বলিল, 'বংশীধর সাধুবাবার কাছে যাচ্ছিল, আমাদের দেখে ভড়কে গিয়ে অন্য পথ ধরেছে।'

বংশীধর তখনও বেশী দূর যায় নাই, পাণ্ডেজি হাঁক দিলেন, 'বংশীধরবাবু!'

বংশীধর ফিরিয়া ভ্রূ নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা কাছে গেলাম, পাণ্ডেজি কৌতুকের সুরে বলিলেন, 'কোথায় চলেছেন হন্‌হনিয়ে?'

বংশীধর রুক্ষ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'বেড়াতে যাচ্ছি।'

পাণ্ডে হাসিয়া বলিলেন, 'এই তো শহর বেড়িয়ে এলেন, আরও বেড়াবেন?'

বংশীধরের রগের শিরা উঁচু হইয়া উঠিল, সে উদ্ধতস্বরে বলিল, 'হ্যাঁ, বেড়াবো। আপনি পুলিশ হতে পারেন, কিন্তু আমার বেড়ানো রুখ্‌তে পারেন না।'

পাণ্ডেজিরও মুখ কঠিন হইল। তিনি কড়া সুরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, পারি। কলেজ হোস্টেলে আপনি একজনকে বিষ খাইয়েছিলেন, সে মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। ফৌজদারী মামলার তামাদি হয় না। আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি।'

ভয়ে বংশীধরের মুখ নীল হইয়া গেল। উগ্রতা এত দ্রুত আতঙ্কে পরিবর্তিত হইতে পারে চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। সে জালবদ্ধ পশুর ন্যায় ক্ষিপ্রচক্ষে এদিক ওদিক চাহিল, তারপর যে পথে আসিয়াছিল সেই সিঁড়ি দিয়া পলকের মধ্যে বাড়ির দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পাণ্ডেজি মৃদুকণ্ঠে হাসিলেন।

'বংশীধরের বিক্রম বোঝা গেছে।—চলুন।'

সাধুবাবার নিকট উপস্থিত হইলাম। চারিদিকের ঝাঁক্‌ড়া গাছ স্থানটিকে প্রায় অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। জ্বলন্ত ধুনির সম্মুখে বাবাজী বসিয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া নীরব অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ হাস্যে তাঁহার মুখ ভরিয়া উঠিল, তিনি হাতের ইশারায় আমাদের বসিতে বলিলেন।

পাণ্ডেজি তাঁহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, হিন্দীতেই কথাবার্তা হইল। পাণ্ডেজির গায়ে পুলিসের খাকি কামিজ ছিল, সাধুবাবা তাঁহার সহিত সমধিক আগ্রহে কথা বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ সাধারণভাবে কথা হইল। সন্ন্যাস জীবনের মাহাত্ম্য এবং গার্হস্থ্য জীবনের পঙ্কিলতা সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত হইলাম। হৃষ্ট বাবাজী ঝুলি হইতে গাঁজা বাহির করিয়া সাজিবার উপক্রম করিলেন।

পাণ্ডেজি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে গাঁজা কোথায় পান বাবা ?'

বাবাজী ঊর্ধ্বে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, 'পরমাৎমা মিলিয়ে দেন বেটা।'

চিমটা দিয়া ধুনী হইতে একখণ্ড অঙ্গার তুলিয়া বাবাজী কলিকার মাথায় রাখিলেন। এই সময় তাঁহার চিমটাটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম। সাধুরা যে নির্ভয়ে বনে-বাদাড়ে বাস করেন তাহা নিতান্ত নিরস্ত্রভাবে নয়। চিম্‌টা ভালভাবে ব্যবহার করিতে জানিলে ইহার দ্বারা বোধ করি বাঘ মারা যায়। আবার তাহার সূচ্যগ্রতীক্ষ্ণ প্রান্ত দুটির সাহায্যে ক্ষুদ্র অঙ্গার খণ্ডও যে তুলিয়া লওয়া যায় তাহা তো স্বচক্ষেই দেখিলাম। সাধুরা এই একটি মাত্র লৌহাস্ত্র দিয়া নানা কার্য সাধন করিয়া থাকেন।

যাহোক, বাবাজী গাঁজার কলিকায় দম দিলেন। তাঁহার গ্রীবা এবং রগের শিরা-উপশিরা ফুলিয়া উঠিল। দীর্ঘ একমিনিটব্যাপী দম দিয়া বাবাজী নিঃশেষিত কলিকাটি উপুড় করিয়া দিলেন।

তারপর ধোঁয়া ছাড়িবার পালা। এ কার্যটি বাবাজি প্রায় তিন মিনিট ধরিয়া করিলেন ; দাড়ি-গোঁফের ভিতর হইতে মন্দ মন্দ ধূম বাহির হইয়া বাতাসকে সুরভিত করিয়া তুলিল।

বাবাজী বলিলেন, 'বম্‌ ! বম্‌ শঙ্কর !'

এই সময় পায়ের শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিলাম একটি লোক আসিতেছে। লোকটি আমাদের দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন চিনিলাম, রামকিশোরবাবু ! তিনি আমাদের চিনিতে পারিয়া স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'ও—আপনারা—!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন।'

রামকিশোর ঈষৎ নিরাশ কণ্ঠে বলিলেন, 'না, আপনারা সাধুজীর সঙ্গে কথা বলছেন বলুন। আমি কেবল দর্শন করতে এসেছিলাম।' জোড়হস্তে সাধুকে প্রণাম করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

সাধুর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম তাঁহার মুখে সেই বিচিত্র হাসি। হাসিটিকে বিশ্লেষণ করিলে কতখানি আধ্যাত্মিকতা এবং কতখানি নষ্টামি পাওয়া যায় তাহা বলা শক্ত। সম্ভবতঃ সমান সমান।

এইবার ব্যোমকেশ বলিল, 'সাধুবাবা, আপনি তো অনেকদিন এখানে আছেন। সেদিন একটি লোক এখানে সর্পাঘাতে মারা গেছে, জানেন কি?'

সাধু বলিলেন, 'জান্‌তা হ্যায়। হম্ ক্যা নহি জানতা!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা সে রাত্রে কেউ দুর্গে গিয়েছিল কি না আপনি দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, দেখা।'

বাবাজীর মুখে আবার সেই আধ্যাত্মিক নষ্টামিভরা হাসি দেখা দিল। ব্যোমকেশ সাগ্রহে আবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, আবার পিছন দিকে পায়ের শব্দ হইল। আমরা ঘাড় ফিরাইলাম, বাবাজীও প্রখর চক্ষে সেই দিকে চাহিলেন। কিন্তু আগন্তুক কেহ আসিল না; হয়তো আমাদের উপস্থিতি জানিতে পারিয়া দূর হইতেই ফিরিয়া গেল।

ব্যোমকেশ আবার বাবাজীকে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলে তিনি ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া পরিষ্কার বাঙলায় বলিলেন, 'এখন নয়। রাত বারোটার সময় এসো, তখন বলব।'

আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ব্যোমকেশ কিন্তু চট করিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'আচ্ছা বাবা, তাই আসব। ওঠ অজিত।'

বৃক্ষ-বাটিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রাত্রি হইয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ ও পাণ্ডেজি চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু সন্দেহভাজন কাহাকেও দেখা গেল না।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমি আজ এখান থেকেই ফিরি। রাত বারোটা পর্যন্ত থাকতে পারলে হত। কিন্তু উপায় নেই। কাল সকালেই আসব।'

পাণ্ডেজি চলিয়া গেলেন।

দুর্গে ফিরিতে ফিরিতে প্রশ্ন করিলাম, 'সাধুবাবা বাঙালী?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সাক্ষাৎ বাঙালী!'

দুর্গে ফিরিয়া ঘড়ি দেখিলাম, সাতটা বাজিয়াছে। মুক্ত আকাশের তলে চেয়ার পাতিয়া বসিলাম।

সাধুবাবা নিশ্চয় কিছু জানে। কী জানে? সে রাত্রে ঈশানবাবুর হত্যাকারীকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল? বৃক্ষ-বাটিকা হইতে দুর্গে

উঠিবার সিঁড়ি দেখা যায় না ; বিশেষতঃ অন্ধকার রাত্রে। তবে কি সাধুবাবা গভীর রাত্রে সিঁড়ির আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় ?......তাহার চিমটা কিন্তু সামান্য অস্ত্র নয়—ঐ চিমটার আগায় বিষ মাখাইয়া যদি—

ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; সে কেবল গলার মধ্যে চাপা কাশির মত শব্দ করিল।

রাত্রি দশটার মধ্যে আহার সমাধা করিয়া আমরা আবার বাহিরে গিয়া বসিলাম। এখনও দু'ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে হইবে। সীতারাম আহার সম্পন্ন করিয়া আড়ালে গেল ; বোধ করি দু' একটা বিড়ি টানিবে। লণ্ঠনটা ঘরের কোণে কমানো আছে।

ঘড়ির কাঁটা এগারোটার দিকে চলিয়াছে। মনের উত্তেজনা সত্ত্বেও ক্রমাগত হাই উঠিতেছে—

'ব্যোমকেশবাবু !'

চাপা গলার শব্দে চমকিয়া জড়তা কাটিয়া গেল। দেখিলাম অদূরে ছায়ার মত একটি মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। ব্যোমকেশ উঠিয়া বলিল, 'রমাপতি ! এস।'

রমাপতিকে লইয়া আমরা ঘরের মধ্যে গেলাম। ব্যোমকেশ আলো বাড়াইয়া দিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, 'এবেলা কিছু খাওয়া হয়নি দেখছি।—সীতারাম !'

সীতারাম পাঁচ মিনিটের মধ্যে কয়েকটা ডিম ভাজিয়া আনিয়া রমাপতির সম্মুখে রাখিল। রমাপতি দ্বিরুক্তি না করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মুখ শুষ্ক, চোখ বসিয়া গিয়াছে ; গায়ের হাফ-শার্ট স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, পায়ে জুতা নাই। খাইতে খাইতে বলিল, 'সব শুনেছেন তাহলে ? কার কাছে শুনলেন ?'

'তুলসীর কাছে। এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?'

'জঙ্গলে। তারপর দুর্গের পেছনে।'

'বেশী মারধর করেছে নাকি ?'

রমাপতি পিঠের কামিজ তুলিয়া দেখাইল, দাগ্ড়া দাগ্ড়া লাল দাগ ফুটিয়া আছে। ব্যোমকেশের মুখ শক্ত হইয়া উঠিল।

'বংশীধর ?'

রমাপতি ঘাড় নাড়িল।

'শহরে চলে গেলে না কেন?'

রমাপতি উত্তর দিল না, নীরবে খাইতে লাগিল।

'এখানে থেকে আর তোমার লাভ কি?'

রমাপতি অস্ফুট স্বরে বলিল, 'তুলসী—'

'তুলসীকে তুমি ভালবাসো?'

রমাপতি একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, 'ওকে সবাই যন্ত্রণা দেয়, ঘরে বন্ধ করে রাখে, কেউ ভালবাসে না। আমি না থাকলে ও মরে যাবে।'

আহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ তাহাকে নিজের বিছানা দেখাইয়া বলিল, 'শোও।'

রমাপতি ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করিল। ব্যোমকেশ দীর্ঘকাল তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল, 'রমাপতি, ঈশানবাবুকে কে খুন করেছে তুমি জানো?'

'না, কে খুন করেছে জানি না। তবে খুন করেছে।'

'হরিপ্রিয়াকে কে খুন করেছিল জানো?'

'না, দিদি বলবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু বলতে পারেনি।'

'বংশীধরের বৌ কেন পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়েছিল জানো?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপতি বলিল, 'জানি না, কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল। দিদি তাকে দেখতে পারত না, দিদির মনটা বড় কুচুটে ছিল। বোধ হয় মুখোশ পরে তাকে ভূতের ভয় দেখিয়েছিল—'

'মুখোশ?'

'দিদির একটা জাপানী মুখোশ ছিল। ঐ ঘটনার পরদিন মুখোশটা জঙ্গলের কিনারায় কুড়িয়ে পেলাম; বোধ হয় হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়েছিল। আমি সেটা এনে দিদিকে দেখালাম, দিদি আমার হাত থেকে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললে।'

'বংশীধর মুখোশের কথা জানে?'

'আমি কিছু বলিনি।'

'সাধুবাবাকে নিশ্চয় দেখেছ। কি মনে হয়?'

'আমার ভক্তি হয় না। কিন্তু কর্তা খুব মান্য করেন। বাড়ি থেকে সিধে যায়।'

'ঈশানবাবু কোনদিন সাধুবাবা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেছিলেন?'

'না। দর্শন করতেও যাননি। উনি সাধু সন্ন্যাসীর ওপর চটা ছিলেন।'

ব্যোমকেশ ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'বারোটা বাজে। রমাপতি, তুমি ঘুমোও, আমরা একটু বেরুচ্ছি।'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রমাপতি বলিল, 'কোথায়!'

'বেশী দূর নয়, শিগ্‌গিরই ফিরব। এস অজিত।'

বড় টর্চটা লইয়া আমরা বাহির হইলাম।

রামকিশোরবাবুর বাড়ি নিষ্প্রদীপ। দেউড়ীর পাশ দিয়া যাইতে যাইতে শুনিলাম বুলাকিলাল সগর্জনে নাক ডাকাইতেছে।

বৃক্ষ-বাটিকায় গাঢ় অন্ধকার, কেবল ভস্মাচ্ছাদিত ধুনি হইতে নিরুদ্ধ প্রভা বাহির হইতেছে। সাধুবাবা ধুনির পাশে শুইয়া আছেন; শয়নের ভঙ্গীটা ঠিক স্বাভাবিক নয়।

ব্যোমকেশ তাঁহার মুখের উপর তীব্র আলো ফেলিল, বাবাজী কিন্তু জাগিলেন না। ব্যোমকেশ তখন তাঁহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিল এবং সশব্দে নিশ্বাস টানিয়া বলিল, 'অ্যাঁ—!'

টর্চের আলো বাবাজীর সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া পায়ের উপর স্থির হইল। দেখা গেল গোড়ালির উপরিভাগে সাপের দাঁতের দুটি দাগ।

১১

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, এতদিনে রামবিনোদ সত্যি সত্যি দেহরক্ষা করিলেন।'

'রামবিনোদ!'

'তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে। বুঝতে পারনি? ধন্য তুমি।'

ধুনিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিয়া বহ্নিমান করিয়া তোলা হইয়াছে। বাবাজীর

শব তাহার পাশে শক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। আমরা দুইজন কিছুদূরে মুখোমুখি উপু হইয়া বসিয়া সিগারেট টানিতেছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'মনে আছে, প্রথম রামকিশোরবাবুকে দেখে চেনা-চেনা মনে হয়েছিল? আসলে তার কিছুক্ষণ আগে বাবাজীকে দেখেছিলাম। দুই ভায়ের চেহারায় সাদৃশ্য আছে; তখন ধরতে পারিনি। দ্বিতীয়বার রাম কিশোরকে দেখে বুঝলাম।'

'কিন্তু রামবিনোদ যে প্লেগে মারা গিয়েছিল!'

'রামবিনোদের প্লেগ হয়েছিল, কিন্তু সে মরবার আগেই বাকি সকলে তাকে চড়ায় ফেলে পালিয়েছিল। চাঁদমোহনের কথা থেকে আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। তারপর রামবিনোদ বেঁচে গেল। এ যেন কতকটা ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার মত।'

'এতদিন কোথায় ছিল?'

'তা জানি না। বোধ হয় প্রথমটা বৈরাগ্য এসেছিল, সাধু সন্ন্যাসীর দলে মিশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারপর হঠাৎ রামকিশোরের সন্ধান পেয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু ওকথা যাক, এখন মড়া আগ্‌লাবার ব্যবস্থা করা দরকার। অজিত, আমি এখানে আছি, তুমি টর্চ নিয়ে যাও, সীতারামকে ডেকে নিয়ে এস। আর যদি পারো, বুলাকিলালের ঘুম ভাঙিয়ে তাকেও ডেকে আনো। ওরা দু'জনে মড়া পাহারা দিক।'

বলিলাম, 'তুমি একলা এখানে থাকবে? সেটি হচ্ছে না। থাকতে হয় দুজনে থাকব, যেতে হয় দু'জনে যাব।'

'ভয় হচ্ছে আমাকেও সাপে ছোব্‌লাবে! এ তেমন সাপ নয় হে, জাগা মানুষকে ছোবলায় না। যাহোক, বলছ যখন, চল দু'জনেই যাই।'

দেউড়িতে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'দাঁড়াও, বুলাকিলালকে জাগানো যাক।'

অনেক ঠেলাঠেলির পর বুলাকিলালের ঘুম ভাঙিল। তাহাকে বাবাজীর মৃত্যুসংবাদ দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ সাধুবাবা ভাঙ খেয়েছিলেন?'

'জী, এক ঘটি খেয়েছিলেন।'

'আর কে কে ভাঙ খেয়েছিল?'

'আর বাড়ি থেকে চাকর এসে এক ঘটি নিয়ে গিয়েছিল।'

'বেশ, এখন যাও, বাবাজীকে পাহারা দাও গিয়ে। আমি সীতারামকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বুলাকিলাল ঝিমাইতে ঝিমাইতে চলিয়া গেল। মনে হইল, ঘুম ভাঙিলেও তাহার নেশার ঘোর কাটে নাই।

দুর্গে ফিরিয়া দেখিলাম সীতারাম জাগিয়া বসিয়া আছে। খবর শুনিয়া সে কেবল একবার চক্ষু বিস্ফারিত করিল, তারপর নিঃশব্দে নামিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে রমাপতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে জাগাইলাম না, বাহিরে আসিয়া বসিলাম। রাত্রি সাড়ে বারোটা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ আর ঘুমনো চলবে না। অন্তত একজনকে জেগে থাকতে হবে। অজিত, তুমি না হয় ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নাও, তারপর তোমাকে তুলে দিয়ে আমি ঘুমবো।'

উঠিতে মন সরিতেছিল না, মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়াছিল। প্রশ্ন করিলাম, 'ব্যোমকেশ, বাবাজীকে মারলে কে?'

'ঈশানবাবুকে যে মেরেছে সে।'

'সে কে?'

'তুমিই বল না। আন্দাজ করতে পারো না?'

এই কথাটাই মাথায় ঘুরিতেছিল। আস্তে আস্তে বলিলাম, 'বাবাজী যদি রামবিনোদ হন তাহলে কে তাঁকে মারতে পারে? এক আছেন রামকিশোরবাবু—'

'তিনি ভাইকে খুন করবেন?'

'তিনি মুমূর্ষু ভাইকে ফেলে পালিয়েছিলেন। সেই ভাই ফিরে এসেছে, হয়তো সম্পত্তির বখরা দাবী করেছে—'

'বেশ, ধরা যাক রামকিশোর ভাইকে খুন করেছেন। কিন্তু ঈশানবাবুকে খুন করলেন কেন?'

'ঈশানবাবু রামবিনোদের প্রাণের বন্ধু ছিলেন, সন্ন্যাসীকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন। হয়তো রামকিশোরকে শাসিয়েছিলেন, ভালয় ভালয় সম্পত্তির ভাগ না দিলে সব ফাঁস করে দেবেন। সন্ন্যাসীকে রামবিনোদ ব'লে সনাক্ত

করতে পারে দু'জন—চাঁদমোহন আর ঈশানবাবু। চাঁদমোহন মালিকের মুঠোর মধ্যে ঈশানবাবুকে সরাতে পারলে সব গোল মিটে যায়—'

ব্যোমকেশ হঠাৎ আমার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল, 'অজিত! ব্যাপার কি হে? তুমি যে ধারাবাহিক যুক্তিসঙ্গত কথা বলতে আরম্ভ করেছ! তবে কি এতদিনে সত্যিই বোধোদয় হল! কিন্তু আর নয়, শুয়ে পড় গিয়ে। ঠিক তিনটের সময় তোমাকে তুলে দেব।'

আমি গমনোদ্যত হইলে সে খাটো গলায় কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'রমাপতি ঘুমোচ্ছে—না মটকা মেরে পড়ে আছে?—যাক, ক্ষতি নেই, আমি জেগে আছি।'

বেলা আটটা আন্দাজ পাণ্ডেজি আসিলেন। বাবাজির মৃত্যুসংবাদ নীচেই পাইয়াছিলেন, বাকি খবরও পাইলেন। ব্যোমকেশ বলিল 'আপনি লাশ নিয়ে ফিরে যান। আবার আসবেন কিন্তু—আর শুনুন—

ব্যোমকেশ তাঁহাকে একটু দূরে লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কিছুক্ষণ কথা বলিল। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'বেশ, আমি দশটার মধ্যেই ফিরব। রমাপতিকে ঘর থেকে বেরুতে দেবেন না।'

তিনি চলিয়া গেলেন।

* * * * *

সাড়ে ন'টার সময় আমি আর ব্যোমকেশ রামকিশোরবাবুর বাড়িতে গেলাম। বৈঠকখানায় তক্তপোশের উপর রামকিশোর বসিয়া ছিলেন, পাশে মণিলাল। বংশীধর ও মুরলীধর তক্তপোশের সামনে পায়চারি করিতেছিল, আমাদের দেখিয়া নিমেষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। বোধ হয় পারিবারিক মন্ত্রণা সভা বসিয়াছিল, আমাদের আবির্ভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

রামকিশোরের গাল বসিয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত। কিন্তু তিনি বাহিরে অবিচলিত আছেন। ক্ষীণ হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন—বসুন।'

তক্তপোশের ধারে চেয়ার টানিয়া বসিলাম। রামকিশোর একবার গলা ঝাড়া দিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিলেন, 'সন্ন্যাসী ঠাকুরকেও সাপে কামড়েছে। ক্রমে দেখছি এখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠল। বংশী

আর মুরলী অবশ্য দু'একদিনের মধ্যে চলে যাচ্ছে, আমরা বাকী ক'জন এখানেই থাকব ভেবেছিলাম। কিন্তু সাপের উৎপাত যদি এভাবে বাড়তেই থাকে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শীতকালে সাপের উৎপাত—আশ্চর্য !'

রামকিশোর বলিলেন, 'তার ওপর বাড়িতে কাল রাত্রে আর এক উৎপাত। এ বাড়িতে আজ পর্যন্ত চোর ঢোকেনি—'

মণিলাল বলিল, 'এ মামুলী চোর নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি হয়েছিল ?'

রামকিশোর বলিলেন, 'আমার শরীর খারাপ হয়ে অবধি মণিলাল রাত্রে আমার ঘরে শোয়। কাল রাত্রে আন্দাজ বারোটার সময়—। মণিলাল, তুমিই বল। আমার যখন ঘুম ভাঙল চোর তখন পালিয়েছে।'

মণিলাল বলিল, 'আমার খুব সজাগ ঘুম। কাল গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, মনে হল দরজার বাইরে পায়ের শব্দ। এ বাড়ির নিয়ম রাত্রে কেউ দোরে খিল দিয়ে শোয় না, এমন কি সদর দরজাও ভেজানো থাকে। আমার মনে হল আমাদের ঘরের দোর কেউ সন্তর্পণে ঠেলে খোলবার চেষ্টা করছে। আমার খাট দরজা থেকে দূরে ; আমি নিঃশব্দে উঠলাম, পা টিপে টিপে দোরের কাছে গেলাম। ঘরে আলো থাকে না, অন্ধকারে দেখলাম দোরের কপাট আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। এই সময় আমি একটা বোকামি করে ফেললাম। আর একটু অপেক্ষা করলেই চোর ঘরে ঢুকতো, তখন তাকে ধরতে পারতাম। তা না করে আমি দরজা টেনে খুলতে গেলাম। চোর সতর্ক ছিল, সে দুড় দুড় করে পালাল।'

রামকিশোর বলিলেন, 'এই সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাকে চোর মনে করছেন সে তুলসী নয় তো ? তুলসীর শুনেছি রাত্রে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আছে।'

রামকিশোরের মুখের ভাব কড়া হইল, তিনি বলিলেন, 'না, তুলসী নয়। তাকে আমি কাল রাত্রে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলাম।'

ব্যোমকেশ মণিলালকে জিজ্ঞাসা করিল, 'চোরকে আপনি চিনতে পারেন নি ?'

'না। কিন্তু—'

'আপনার বিশ্বাস চেনা লোক?'

'হ্যাঁ।'

রামকিশোর বলিলেন, 'লুকোছাপার দরকার নেই। আপনারা তো জানেন রমাপতিকে কাল আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। মণিলালের বিশ্বাস সেই কোন মতলবে এসেছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক ক'টার সময় এই ব্যাপার ঘটেছিল বলতে পারেন কি?'

রামকিশোর বলিলেন, 'ঠিক পৌনে বারোটার সময়। আমার বালিশের তলায় ঘড়ি থাকে, আমি দেখেছি।'

ব্যোমকেশ আমার পানে সঙ্কেতপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল, আমি মুখ টিপিয়া রহিলাম। রমাপতি যে পৌনে বারোটার সময় ব্যোমকেশের খাটে শুইয়া ছিল তাহা বলিলাম না।

রামকিশোর বিষণ্ন গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'আজ সকালে আর একটা কথা জানা গেল। রমাপতি তার জিনিসপত্র নিয়ে যায়নি, তার ঘরেই পড়ে ছিল। আজ সকালে ঘর তল্লাস করালাম। তার টিনের ভাঙা তোরঙ্গ থেকে এই জিনিসটা পাওয়া গেল।' পকেট হইতে একটি সোনার কাঁটা বাহির করিয়া তিনি ব্যোমকেশের হাতে দিলেন।

মেয়েরা যে-ধরনের লোহার দু'ভাঁজ কাঁটা দিয়া চুল বাঁধেন সেই ধরণের সোনার কাঁটা। আকারে একটু বড় ও স্থূল, দুই প্রান্ত ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ। সেটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া ব্যোমকেশ সপ্রশ্নচক্ষে রামকিশোরের পানে চাহিল; তিনি বলিলেন, 'আমার বড় মেয়ে হরিপ্রিয়ার চুলের কাঁটা। তার মৃত্যুর পর হারিয়ে গিয়েছিল।'

কাঁটা ফেরৎ দিয়া ব্যোমকেশ পূর্ণদৃষ্টিতে রামকিশোরের পানে চাহিয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবু, এবার সোজাসুজি বোঝাপড়ার সময় হয়েছে।'

রামকিশোর যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, 'বোঝাপড়া!'

'হ্যাঁ। আপনার দাদা রামবিনোদবাবুর মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।'

রামকিশোরের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তিনি কথা বলিবার জন্য মুখ খুলিলেন, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তারপর অতিকষ্টে নিজেকে আয়ত্ত করিতে করিতে অর্ধরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, 'আমার দাদা—! কার কথা বলছেন আপনি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কার কথা বলছি তা আপনি জানেন। মিথ্যে অভিনয় ক'রে লাভ নেই। সর্পাঘাত যে সত্যিকার সর্পাঘাত নয় তাও আমরা জানি। আপনার দাদাকে কাল রাত্রে খুন করা হয়েছে।'

মণিলাল বলিয়া উঠিল, 'খুন করা হয়েছে !'

'হ্যাঁ! আপনি জানেন কি, সন্ন্যাসীঠাকুর হচ্ছেন, আপনার শ্বশুরের দাদা, রামবিনোদ সিংহ !'

রামকিশোর এতক্ষণে অনেকটা সামলাইয়াছেন, তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন, 'মিথ্যে কথা! আমার দাদা অনেকদিন আগে প্লেগে মারা গেছেন। এসব রোমান্টিক গল্প কোথা থেকে তৈরি করে আনলেন ? সন্ন্যাসী আমার দাদা প্রমাণ করতে পারেন ! সাক্ষী আছে ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একজন সাক্ষী ছিলেন ঈশানবাবু, তাঁকেও খুন করা হয়েছে।'

রামকিশোর এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, উর্ধ্বস্বরে বলিলেন, 'মিথ্যে কথা! মিথ্যে! এসব পুলিসের কারসাজি। যান আপনারা আমার বাড়ি থেকে, এই দণ্ডে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যান। আমার এলাকায় পুলিশের গুপ্তচরের জায়গা নেই।'

এই সময় বাহিরে জানালায় মুরলীধরের ভয়ার্ত মুখ দেখা গেল—'বাবা! পুলিস বাড়ি ঘেরাও করেছে।' বলিয়াই সে অপসৃত হইল।

চমকিয়া দ্বারের দিকে ফিরিয়া দেখি পায়ের বুট হইতে মাথার হেলমেট্ পর্যন্ত পুলিস পোষাক-পরা পাণ্ডেজি ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহার পিছনে ব্যাগ হাতে ডাঃ ঘটক।

পাণ্ডে বলিলেন, 'তল্লাসী পরোয়ানা আছে, আপনার বাড়ি খানাতল্লাস করব। ওয়ারেণ্ট দেখতে চান?'

রামকিশোর ভীত পাংশুমুখে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ভাঙা গলায় বলিলেন, 'এর মানে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আপনার এলাকায় দু'টো খুন হয়েছে। পুলিসের বিশ্বাস অপরাধী এবং অপরাধের প্রমাণ এই বাড়িতেই আছে। আমরা সার্চ করে দেখতে চাই।'

রামকিশোর আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া 'বেশ, যা ইচ্ছে করুন'—বলিয়া তাকিয়ার উপর এলাইয়া পড়িলেন।

'ডাক্তার!'

ডাক্তার ঘটক প্রস্তুত ছিল, দুই মিনিটের মধ্যে রামকিশোরকে ইন্‌জেকশন দিল। তারপর নাড়ী টিপিয়া বলিল, 'ভয় নেই।'

ইতিমধ্যে আমি জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাহিরে পুলিস গিস্‌গিস্ করিতেছে; সিঁড়ির মুখে অনেকগুলা কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ইন্সপেক্টর দুবে ঘরে আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল, 'সকলে নিজের নিজের ঘরে আছে, বেরুতে মানা করে দিয়েছি।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বেশ। দু'জন বে-সরকারী সাক্ষী চাই। অজিতবাবু, ব্যোমকেশবাবু, আপনারা সাক্ষী থাকুন। পুলিশ কোনও বে-আইনী কাজ করে কি না আপনারা লক্ষ্য রাখবেন।'

মণিলাল এতক্ষণ আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, আমিও কি নিজের ঘরে গিয়ে থাকব?'

পাণ্ডে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'মণিলালবাবু! না চলুন, আপনার ঘরটাই আগে দেখা যাক।'

'আসুন।'

পাণ্ডে, দুবে, ব্যোমকেশ ও আমি মণিলালের অনুসরণ করিয়া তাহার

ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি বেশ বড়, একপাশে খাট, তাছাড়া আলমারি দেরাজ প্রভৃতি আসবাব আছে।

মণিলাল বলিল, 'কি দেখবেন দেখুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশী কিছু দেখবার নেই। আপনার দুটো ফাউন্টেন পেন আছে, সেই দুটো দেখলেই চলবে।'

মণিলালের মুখ হইতে ক্ষণকালের জন্য যেন একটা মুখোশ সরিয়া গেল। সেই যে ব্যোমকেশ বলিয়াছিল, গর্দভচর্মাবৃত সিংহ, মনে হইল সেই হিংস্র শ্বাপদটা নিরীহ চর্মাবরণ ছাড়িয়া বাহির হইল; একটা ভয়ঙ্কর মুখ পলকের জন্য দেখিতে পাইলাম। তারপর মণিলাল গিয়া দেরাজ খুলিল; দেরাজ হইতে পার্কারের কলমটি বাহির করিয়া দ্রুতহস্তে তাহার দু'দিকের ঢাক্‌নি খুলিয়া ফেলিল; কলমটাকে ছোরার মত মুঠিতে ধরিয়া ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল। সে-চক্ষে যে কী ভীষণ হিংসা ও ক্রোধ ছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। মণিলাল শ্বাদন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল, 'এই যে কলম। নেবে? এস, নেবে এস।'

আমরা জড়মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাণ্ডে কোমর হইতে রিভলবার বাহির করিলেন।

মণিলাল হায়েনার মত হাসিল। তারপর নিজের বামহাতের কব্জির উপর কলমের নিব বিঁধিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কালিভরা পিচ্‌কারিটা টিপিয়া ধরিল।

ব্যোমকেশ রামকিশোরবাবুকে বলিল, 'দুধ কলা খাইয়ে কালসাপ পুষেছিলেন। ভাগ্যে পুলিশের এই গুপ্তচরটা ছিল তাই বেঁচে গেলেন। কিন্তু এবার আমরা চললাম, আপনার আতিথ্যে আর আমাদের রুচি নেই। কেবল সাপের বিষের শিশিটা নিয়ে যাচ্ছি।'

রামকিশোর বিহ্বল ব্যাকুল চক্ষে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ দ্বার পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'আর একটা কথা বলে যাই। আপনার পূর্বপুরুষেরা অনেক সোনা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। সে সোনা কোথায় আছে আমি জানি। কিন্তু যে-জিনিস আমার নয় তা আমি ছুঁতেও চাই না। আপনার পৈতৃকসম্পত্তি আপনি ভোগ করুন।— চলুন পাণ্ডেজি। এস অজিত।'

অপরাহ্ণে পাণ্ডেজির বাসায় আরাম-কেদারায় অর্ধশয়ান হইয়া ব্যোমকেশ গল্প বলিতেছিল। শ্রোতা ছিলাম আমি, পাণ্ডেজি এবং রমাপতি।

'খুব সংক্ষেপে বলছি। যদি কিছু বাদ পড়ে যায়, প্রশ্ন কোরো।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'একটা কথা আগে বলে নিই। সেই যে শাদা গুঁড়ো পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন, কেমিস্টের রিপোর্ট এসেছে। এই দেখুন।'

রিপোর্ট পড়িয়া ব্যোমকেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিল—'Sodium Tetra Borate—Borax, মানে সোহাগা? সোহাগা কোন্ কাজে লাগে? এক তো জানি, সোনায় সোহাগা। আর কোনও কাজে লাগে কি?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'ঠিক জানি না। সেকালে হয়তো ওষুধ-বিষুধ তৈরির কাজে লাগত।'

রিপোর্ট ফিরাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। এবার শোনো। মণিলাল বাইরে বেশ ভাল মানুষটি ছিল, কিন্তু তার স্বভাব রাক্ষসের মত; যেমন নিষ্ঠুর তেমনি লোভী। বিয়ের পর সে মনে মনে ঠিক করল শ্বশুরের গোটা সম্পত্তিটাই গ্রাস করবে। শালাদের কাছ থেকে সে সদ্ব্যবহার পায়নি, স্ত্রীকেও ভালবাসেনি। কেবল শ্বশুরকে নরম ব্যবহারে বশ করেছিল।

'মণিলালের প্রথম সুযোগ হল যখন একদল বেদে এসে ওখানে তাঁবু ফেলল। সে গোপনে তাদের কাছ থেকে সাপের বিষ সংগ্রহ করল।

'স্ত্রীকে সে প্রথমেই কেন খুন করল আপাতদৃষ্টিতে তা ধরা যায় না। হয়তো দুর্বল মুহূর্তে স্ত্রীর কাছে নিজের মতলব ব্যক্ত করে ফেলেছিল, কিম্বা হয়তো হরিপ্রিয়াই কলমে সাপের বিষ ভরার প্রক্রিয়া দেখে ফেলেছিল। মোট কথা প্রথমেই হরিপ্রিয়াকে সরানো দরকার হয়েছিল। কিন্তু তাতে একটা মস্ত অসুবিধে, শ্বশুরের সঙ্গে সম্পর্কই ঘুচে যায়। মণিলাল কিন্তু শ্বশুরকে এমন বশ করেছিল যে তার বিশ্বাস ছিল রামকিশোর তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবেন না। তুলসীর দিকে তার নজর ছিল।

'যাহোক, হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর পর কোনও গণ্ডগোল হল না, তুলসীর সঙ্গে কথা পাকা হয়ে রইল। মণিলাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল, সম্পর্কটা একবার পাকা হয়ে গেলেই শালাগুলিকে একে একে সরাবে।

দু'বছর কেটে গেল, তুলসী প্রায় বিয়ের যুগ্যি হয়ে এসেছে, এমন সময় এলেন ঈশানবাবু ; তার কিছুদিন পরে এসে জুটলেন সাধুবাবা। এঁদের দু'জনের মধ্যে অবশ্য কোনও সংযোগ ছিল না ; দু'জনে শেষ পর্যন্ত জানতে পারেননি যে বন্ধুর এত কাছে আছেন।

'রামকিশোরবাবু ভাইকে মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়েছেন এ গ্লানি তাঁর মনে ছিল। সন্ন্যাসীকে চিনতে পেরে তাঁর হৃদয়যন্ত্র খারাপ হয়ে গেল, যায়-যায় অবস্থা। একটু সামলে উঠে তিনি ভাইকে বললেন, 'যা হবার হয়েছে, কিন্তু এখন সত্যি কথা প্রকাশ হলে আমার বড় কলঙ্ক হবে। তুমি কোনও তীর্থস্থানে গিয়ে মঠ তৈরি করে থাকো, যত খরচ লাগে আমি দেব।' রামবিনোদ কিন্তু ভাইকে বাগে পেয়েছেন, তিনি নড়লেন না ; গাছতলায় বসে ভাইকে অভিসম্পাত দিতে লাগলেন।

'এটা আমার অনুমান। কিন্তু রামকিশোর যদি কখনও সত্যি কথা বলেন, দেখবে অনুমান মিথ্যে নয়। মণিলাল কিন্তু শ্বশুরের অসুখে বড় মুশকিলে পড়ে গেল ; শ্বশুর যদি হঠাৎ পটল তোলে তার সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে, শালারা তদ্দণ্ডেই তাকে তাড়িয়ে দেবে। সে শ্বশুরকে মন্ত্রণা দিতে লাগল, বড় দুই ছেলেকে পৃথক করে দিতে। তাতে মণিলালের লাভ, রামকিশোর যদি হার্টফেল করে মরেও যান, নাবালকদের অভিভাবকরূপে অর্ধেক সম্পত্তি তার কব্জায় আসবে। তারপর তুলসীকে সে বিয়ে করবে, আর গদাধর সর্পাঘাতে মরবে।

'মণিলালকে রামকিশোর অগাধ বিশ্বাস করতেন, তাছাড়া তাঁর নিজেরও ভয় ছিল তাঁর মৃত্যুর পর বড় দুই ছেলে নাবালক ভাইবোনকে বঞ্চিত করবে। তিনি রাজি হলেন ; উকিলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

'ওদিকে দুর্গে আর একটি ঘটনা ঘটছিল ; ঈশানবাবু গুপ্তধনের সন্ধানে লেগেছিলেন। প্রথমে তিনি পাটিতে খোদাই করা ফারসী লেখাটা পেলেন। লেখাটা তিনি সযত্নে খাতায় টুকে রাখলেন এবং অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। তারপর নিজের শোবার ঘরে গজাল নাড়তে নাড়তে দেখলেন একটা পাথর আলগা। বুঝতে বাকি রইল না যে, ঐ পাথরের তলায় দুর্গের তোষাখানা আছে।

'কিন্তু পাথরটা জগদ্দল ভারী; ঈশানবাবু রুগ্ন বৃদ্ধ। পাথর সরিয়ে তোষাখানায় ঢুকবেন কি করে? ঈশানবাবুর মনে পাপ ছিল, অভাবে তাঁর স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। তিনি রামকিশোরকে খবর দিলেন না, একজন সহকারী খুঁজতে লাগলেন।

'দু'জন পূর্ণবয়স্ক লোক তাঁর কাছে নিত্য যাতায়াত করত, রমাপতি আর মণিলাল। ঈশানবাবু মণিলালকে বেছে নিলেন। কারণ মণিলাল ষণ্ডা বেশী। আর সে শালাদের ওপর খুশী নয় তাও ঈশানবাবু বুঝেছিলেন।

'বোধ হয় আধাআধি বখরা ঠিক হয়েছিল। মণিলাল কিন্তু মনে মনে ঠিক করলে সবটাই সে নেবে, শ্বশুরের জিনিস পরের হাতে যাবে কেন? নির্দিষ্ট রাত্রে দু'জনে পাথর সরিয়ে তোষাখানায় নামলেন।

'হাঁড়িকলসীগুলো তল্লাস করবার আগেই ঈশানবাবু মেঝের ওপর একটা মোহর কুড়িয়ে পেলেন। মণিলালের ধারণা হল হাঁড়ি কলসীতে মোহর ভরা আছে। সে আর দেরি করল না, হাতের টর্চ দিয়ে ঈশানবাবুর ঘাড়ে মারল এক ঘা। ঈশানবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর তাঁর পায়ে কলমের খোঁচা দেওয়া শক্ত হল না।

'কিন্তু খুনীর মনে সর্বদাই একটা ত্বরা জেগে থাকে। মণিলাল ঈশান-বাবুর দেহ ওপরে নিয়ে এল। এই সময় আমার মনে হয়, বাইরে থেকে কোনও ব্যাঘাত এসেছিল! মুরলীধর ঈশানবাবুকে তাড়াবার জন্যে ভয় দেখাচ্ছিলই, হয়তো সেই সময় ইট-পাটকেল ফেলেছিল। মণিলাল ভয় পেয়ে গুপ্তদ্বার বন্ধ করে দিল। হাঁড়িগুলো দেখা হল না; টর্চটাও তোষা-খানায় রয়ে গেল।

'তোষাখানায় যে সোনাদানা কিছু নেই একথা বোধ হয় মণিলাল শেষ পর্যন্ত জানতে পারে নি। ঈশানবাবুর মৃত্যুর হাঙ্গামা জুড়োতে না জুড়োতে আমরা গিয়ে বসলাম; সে আর খোঁজ নিতে পারল না। কিন্তু তার ধৈর্যের অভাব ছিল না; সে অপেক্ষা করতে লাগল, আর শ্বশুরকে ভজাতে লাগল দুর্গটা যাতে তুলসীর ভাগে পড়ে।

'আমরা স্রেফ হাওয়া বদলাতে যাইনি, এ সন্দেহ তার মনে গোড়া থেকেই ধোঁয়াচ্ছিল, কিন্তু কিছু করবার ছিল না। তারপর কাল বিকেল থেকে এমন

কয়েকটা ঘটনা ঘটল যে মণিলাল ভয় পেয়ে গেল। তুলসী তার কলম চুরি করে রমাপতিকে দিতে গেল। কলমে তখন বিষ ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু কলম সম্বন্ধে তার দুর্বলতা স্বাভাবিক। রমাপতিকে সে দেখতে পারত না—ভাবী পত্নীর প্রেমাস্পদকে কেই বা দেখতে পারে? এই ছুতো করে সে রমাপতিকে তাড়ালো। যাহোক, এ পর্যন্ত বিশেষ ক্ষতি হয়নি, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা আর এক ব্যাপার ঘটল। আমরা যখন সাধুবাবার কাছে বসে তাঁর লম্বা লম্বা কথা শুনছি 'হুম ক্যা নহি জানতা' ইত্যাদি,—সেই সময় মণিলাল বাবাজীর কাছে আসছিল; দূর থেকে তার আস্ফালন শুনে ভাবল, বাবাজী নিশ্চয় তাকে ঈশানবাবুর মৃত্যুর রাত্রে দুর্গে যেতে দেখেছিলেন, সেই কথা তিনি দুপুর রাত্রে আমাদের কাছে ফাঁস করে দেবেন।

'মণিলাল দেখল, সর্বনাশ! তার খুনের সাক্ষী আছে। বাবাজী যে ঈশানবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তা সে ভাবতে পারল না; ঠিক করল রাত বারোটার আগেই বাবাজীকে সাবাড় করবে।'

'আমরা চলে আসবার পর বাবাজী এক ঘটি সিদ্ধি চড়ালেন। তারপর বোধহয় মণিলাল গিয়ে আর এক ঘটি খাইয়ে এল। বাবাজী নির্ভয়ে খেলেন, কারণ মণিলালের ওপর তাঁর সন্দেহ নেই। তারপর তিনি নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন; এবং যথাসময়ে মণিলাল এসে তাঁকে মহাসুষুপ্তির দেশে পাঠিয়ে দিলে।'

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি কিছু জানতেন না, তবে আমাদের রাত দুপুরে ডেকেছিলেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডেকেছিলেন তাঁর নিজের কাহিনী শোনাবার জন্যে, নিজের আসল পরিচয় দেবার জন্যে।'

'আর একটা কথা। কাল রাত্রে যে রামকিশোরবাবুর ঘরে চোর ঢুকেছিল সে চোরটা কে?'

'কাল্পনিক চোর। মণিলাল সাধুবাবাকে খুন করে ফিরে আসবার সময় ঘরে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছিল, তাতে রামকিশোরবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। তাই চোরের আবির্ভাব। রামকিশোরবাবু আফিম খান, আফিম-খোরের ঘুম সহজে ভাঙে না, তাই মণিলাল নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল তখন

মণিলাল চট্‌ করে একটা গল্প বানিয়ে ফেলল। তাতে রমাপতির ওপর একটা নতুন সন্দেহ জাগানো হল, নিজের ওপর থেকে সন্দেহ সরানো হল। রমাপতির তোরঙ্গতে হরিপ্রিয়ার সোনার কাঁটা লুকিয়ে রেখেও ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। যা শত্রু পরে পরে। যদি কোনও বিষয়ে কারুর উপর সন্দেহ হয় রমাপতির ওপর সন্দেহ হবে।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল।

প্রশ্ন করিলাম, 'মণিলাল যে আসামী এটা বুঝলে কখন?'

ব্যোমকেশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'অস্ত্রটা কী তাই প্রথমে ধরতে পারছিলাম না। তুলসী প্রথম যখন ফাউণ্টেন পেনের উল্লেখ করল, তখন সন্দেহ হল। তারপর মণিলাল যখন ফাউণ্টেন পেন আমার হাতে দিলে তখন এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। মণিলাল নিজেই বললে বাড়িতে আর কারুর ফাউণ্টেন পেন নেই। কেমন সহজ অস্ত্র দেখ? সর্বদা পকেটে বাহার দিয়ে বেড়াও, কেউ সন্দেহ করবে না।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর পাণ্ডেজি বলিলেন, 'গুপ্তধনের রহস্যটা কিন্তু এখনও চাপাই আছে।'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিল।

বাড়ির সদরে একটা মোটর আসিয়া থামিল এবং হর্ণ বাজাইল। জানালা দিয়া দেখিলাম, মোটর হইতে নামিলেন রামকিশোরবাবু ও ডাক্তার ঘটক।

ঘরে প্রবেশ করিয়া রামকিশোর জোড়হস্তে বলিলেন, 'আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন। বুদ্ধির দোষে আমি সব ভুল বুঝেছিলাম। রমাপতি, তোকেই আমি সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছি বাবা। তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল্‌।'

রমাপতি সলজ্জে তাহাকে প্রণাম করিল।

১৩

রামকিশোরবাবুকে খাতির করিয়া বসানো হইল। পাণ্ডেজি বোধকরি চায়ের হুকুম দিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

ডাক্তার ঘটক হাসিয়া বলিল, 'আমার রুগীর পক্ষে বেশী উত্তেজনা কিন্তু

ভাল নয়। উনি জোর করলেন বলে'ই সঙ্গে নিয়ে এসেছি, নইলে ওঁর উচিত বিছানায় শুয়ে থাকা।'

রামকিশোর গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'আর উত্তেজনা! আজ সকাল থেকে আমার ওপর দিয়ে যা গেছে তাতেও যখন বেঁচে আছি তখন আর ভয় নেই ডাক্তার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যিই আর ভয় নেই। একে তো সব বিপদ কেটে গেছে, তার ওপর ডাক্তার পেয়েছেন। ডাক্তার ঘটক যে কত ভাল ডাক্তার তা আমি জানি কিনা। কিন্তু একটা কথা বলুন। সন্ন্যাসীকে দাদা বলতে কি আপনি এখনও রাজি নন?'

রামকিশোর লজ্জায় নতমুখ হইলেন।

'ব্যোমকেশবাবু, নিজের লজ্জাতে নিজেই মরে আছি, আপনি আর লজ্জা দেবেন না। দাদাকে হাতে পায়ে ধরেছিলাম, দাদা সংসারী হতে রাজী হননি। বলেছিলাম, আমি হরিদ্বারে মন্দির করে দিচ্ছি সেখানে সেবায়েৎ হয়ে রাজার হালে থাকুন। দাদা শুনলেন না। শুনলে হয়তো অপঘাত মৃত্যু হত না।' তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন।

পাণ্ডেজি ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার হাতে আমাদের পূর্বদৃষ্ট মোহরটি। সেটি রামকিশোরকে দিয়া বলিলেন, 'আপনার জিনিস আপনি রাখুন।'

রামকিশোর সাগ্রহে মোহরটি লইয়া দেখিলেন, কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, 'আমার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি। তাঁরা সবই রেখে গিয়েছিলেন, আমাদের কপালের দোষে এতদিন পাইনি। ব্যোমকেশবাবু, সত্যিই কি সন্ধান পেয়েছেন?'

'পেয়েছি বলেই আমার বিশ্বাস। তবে চোখে দেখিনি।'

'তাহলে—তাহলে—!' রামকিশোরবাবু ঢোঁক গিলিলেন।

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিল।

'আপনার এলাকার মধ্যেই আছে। খুঁজে নিন না।'

'খোঁজবার কি ত্রুটি করেছি, ব্যোমকেশবাবু? কেল্লা কিনে অবধি তার আগাপাস্তলা তন্ন তন্ন করেছি। পাইনি; হতাশ হয়ে ভেবেছি সিপাহীরা লুটেপুটে নিয়ে গেছে। আপনি যদি জানেন, বলুন। আমি আপনাকে

বঞ্চিত করব না, আপনিও বখরা পাবেন। এঁদের সালিশ মানছি, পাণ্ডেজি আর ডাক্তার ঘটক যা ন্যায্য বিবেচনা করবেন তাই দেব। আপনি আমার অশেষ উপকার করেছেন, যদি অর্ধেক বখরাও চান—'

ব্যোমকেশ নীরস স্বরে বলিল, 'বখরা চাই না। কিন্তু দুটো শর্ত আছে।

'শর্ত! কী শর্ত?'

প্রথম শর্ত, রমাপতির সঙ্গে তুলসীর বিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, বিয়ের যৌতুক হিসেবে আপনার দুর্গ রমাপতিকে লেখাপড়া করে দিতে হবে।'

ব্যোমকেশ যে ভিতরে ভিতরে ঘটকালি করিতেছে তাহা সন্দেহ করি নাই। সকলে উচ্চকিত হইয়া উঠিলাম। রমাপতি লজ্জিত মুখে সরিয়া গেল।

রামকিশোর কয়েক মিনিট হেঁটমুখে চিন্তা করিয়া মুখ তুলিলেন। বলিলেন, 'তাই হবে। রমাপতিকে আমার অপছন্দ নয়। ওকে চিনি, ও ভাল ছেলে। অন্য কোথাও বিয়ে দিলে আবার হয়তো একটা ভূত-বাঁদর জুটবে। তার দরকার নেই।'

'আর দুর্গ?'

'দুর্গ লেখাপড়া করে দেব। আপনি চান পৈতৃক সোনাদানা তুলসী আর রমাপতি পাবে, এই তো? বেশ তাই হবে।'

'কথার নড়চড় হবে না?'

রামকিশোর একটু কড়াস্বরে বলিলেন, 'আমি রাজা জানকীরামের সন্তান। কথার নড়চড় কখনও করিনি।'

'বেশ। আজ তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কাল সকালে আমরা যাব।'

পরদিন প্রভাতে আমরা আবার দুর্গে উপস্থিত হইলাম। আমরা চারজন—আমি, ব্যোমকেশ, পাণ্ডেজি ও সীতারাম। অন্য পক্ষ হইতে কেবল রামকিশোর ও রমাপতি। বুলাকিলালকে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল দুর্গে যেন আর কেহ না আসে। সে দেউড়িতে পাহারা দিতেছিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনারা অনেক বছর ধরে খুঁজে খুঁজে যা পাননি

ঈশানবাবু দু'হপ্তায় তা খুঁজে বার করেছিলেন। তার কারণ তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ ছিলেন, কোথায় খুঁজতে হয় জানতেন। প্রথমে তিনি পেলেন একটা শিলালিপি, তাতে লেখা ছিল,—'যদি আমি বা জয়রাম বাঁচিয়া না থাকি আমাদের তামাম ধনসম্পত্তি সোনাদানা মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রহিল।' এ লিপি রাজারামের লেখা। কিন্তু মোহনলাল কে? ঈশানবাবু বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারলে মনে হয় কোন গণ্ডগোলই হত না, তিনি চুরি করবার বৃথা চেষ্টা না করে সরাসরি রামকিশোরকে খবর দিতেন।

'তারপর ঈশানবাবু পেলেন গুপ্ত তোষাখানার সন্ধান; ভাবলেন সব সোনাদানা সেইখানেই আছে। আমরা জানি তোষাখানায় একটি গড়িয়ে পড়া মোহর ছাড়া আর কিছুই ছিল না; বাকি সব কিছু রাজারাম সরিয়ে ফেলেছিলেন। এইখানে বলে রাখি, সিপাহীরা তোষাখানা খুঁজে পায়নি; পেলে হাঁড়িকলসীগুলো আস্ত থাকত না।

'সে যাক। প্রশ্ন হচ্ছে, মোহনলাল কে, যার জিম্মায় রাজারাম তামাম ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় মোহনলাল মানুষ হতে পারে না। দুর্গে সে সময় রাজারাম আর জয়রাম ছাড়া কেউ ছিল না; রাজারাম সকলকে বিদেয় করে দিয়েছিলেন। তবে কার জিম্মায় সোনাদানা গচ্ছিত রাখলেন? মোহনলাল কেমন জীব?

'আমিও প্রথমটা কিছু ধরতে পারছিলাম না। তারপর অজিত হঠাৎ একদিন পলাশীর যুদ্ধ আবৃত্তি করল—"আবার আবার সেই কামান গর্জন—গর্জিল মোহনলাল..."। কামান—মোহনলাল। সেকালে বড় বড় বীরের নামে কামানের নামকরণ হত। বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল মোহনলাল কে! কার জিম্মায় সোনাদানা আছে। ঐ যে মোহনলাল।' ব্যোমকেশ অঙ্গুলি দিয়া ভূমিশয়ান কামানটি দেখাইল।

আমরা সকলেই উত্তেজিত হইয়াছিলাম; রামকিশোর অস্থির হইয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ! তাহলে কামানের নীচে সোনা পোঁতা আছে!'

'কামানের নীচে নয়। সেকালে সকলেই মাটিতে সোনা পুঁতে রাখত; রাজারাম অমন কাঁচা কাজ করেননি। তিনি কামানের নলের মধ্যে সোনা ঢেলে দিয়ে কামানের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঐ যে দেখছেন কামানের মুখ

থেকে শুকনো ঘাসের গোছা গলা বাড়িয়ে আছে, একশো বছর আগে সিপাহীরাও অমনি শুকনো ঘাস দেখেছিল; তারা ভাবতেও পারেনি যে ভাঙা অকর্মণ্য কামানের পেটের মধ্যে সোনা জমাট হয়ে আছে।'

রামকিশোর অধীর কণ্ঠে বলিলেন, 'তবে আর দেরি কেন? আসুন, মাটি খুঁড়ে মোহর বের করা যাক।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহর? মোহর কোথায়? মোহর আর নেই রামকিশোরবাবু। রাজারাম এমন বুদ্ধি খেলিয়েছিলেন যে সিপাহীরা সন্ধান পেলেও সোনা তুলে নিয়ে যেতে পারত না।'

'মানে—মানে—কিছু বুঝতে পারছি না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাণ্ডেজি, তোষাখানায় একটা উনন আর হাপর দেখেছিলেন মনে আছে? সোহাগাও একটা হাঁড়িতে ছিল। বুঝতে পারলেন? রাজারাম তাঁর সমস্ত মোহর গলিয়ে ঐ কামানের মুখে ঢেলে দিয়েছিলেন। ওর ভেতরে আছে জমাট সোনার একটা থাম।'

'তাহলে—তাহলে—!'

'ওর মুখ থেকে মাটি খুঁড়ে সোনা দেখতে পাবেন হয়তো। কিন্তু বার করতে পারবেন না।'

'তবে উপায়?'

'উপায় পরে করবেন। কলকাতা থেকে অক্‌সি-অ্যাসিটিলিন্ আনিয়ে কামান কাটতে হবে; তিন ইঞ্চি পুরু লোহা ছেনি বাটালি দিয়ে কাটা যাবে না। আপাতত মাটি খুঁড়ে দেখা যেতে পারে আমার অনুমান সত্যি কিনা।—সীতারাম!'

সীতারামের হাতে লোহার তুরপুন প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ছিল। আদেশ পাইয়া সে ঘোড়সোয়ারের মত কামানের পিঠে চড়িয়া বসিল। আমরা নীচে কামানের মুখের কাছে সমবেত হইলাম। সীতারাম মহা উৎসাহে মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

প্রায় এক ফুট কাটিবার পর সীতারাম বলিল, 'হুজুর, আর কাটা যাচ্ছে না। শক্ত লাগছে!'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'লাগাও তুরপুন!'

সীতারাম তখন কামানের মুখের মধ্যে তুরপুন ঢুকাইয়া পাক দিতে আরম্ভ

করিল। দু'চারবার ঘুরাইবার পর চাক্‌লা চাক্‌লা সোনার ফালি ছিটকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমরা সকলে উত্তেজনায় দিশাহারা হইয়া কেবল অর্থহীন চীৎকার করিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'ব্যস, সীতারাম, এবার বন্ধ কর। আমার অনুমান যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। রামকিশোরবাবু, দুর্গের মুখে মজবুত দরজা বসান, পাহারা বসান; যতদিন না সব সোনা বেরোয় ততদিন আপনারা সপরিবারে এসে এখানে বাস করুন। এত সোনা আলগা ফেলে রাখবেন না।'

সেদিন বাসায় ফিরিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম ব্যোমকেশের নামে 'তার' আসিয়াছে। আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। হঠাৎ 'তার' কেন? কাহার 'তার'?—সত্যবতী ভাল আছে তো!

তারের খাম ছিঁড়িতে ব্যোমকেশের হাত একটু কাঁপিয়া গেল। আমি অদূরে দাঁড়াইয়া অপলকচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

'তার' পড়িতে পড়িতে তাহার মুখখানা কেমন এক রকম হইয়া গেল; তারপর সে মুখ তুলিল। গলা ঝাড়া দিয়া বলিল, 'ওদিকেও সোনা।'

'সোনা?'

'হ্যাঁ—ছেলে হয়েছে।'

ছয় মাস পরে বৈশাখের গোড়ার দিকে কলকাতা শহরে গরম পড়ি-পড়ি করিতেছিল। একদিন সকালবেলা আমি এবং ব্যোমকেশ ভাগাভাগি করিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি, সত্যবতী একবাটি দুধ ও ছেলে লইয়া মেঝেয় বসিয়াছে, দুধ খাওয়ানো উপলক্ষে মাতাপুত্রে মল্লযুদ্ধ চলিতেছিল, এমন সময় সদর দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দ হইল। সত্যবতী ছেলে লইয়া পলাইবার উপক্রম করিল। আমি দ্বার খুলিয়া দেখি রমাপতি ও তুলসী। রমাপতির হাতে একটি চৌকশ বাক্স, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, মুখে সলজ্জ হাসি।

তুলসীকে দেখিয়া আর চেনা যায় না। এই কয় মাসে সে রীতিমত একটা যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসে তাহাদের বিবাহ উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু যাইতে পারি নাই। ছয় মাস পরে তাহাদের দেখিলাম।